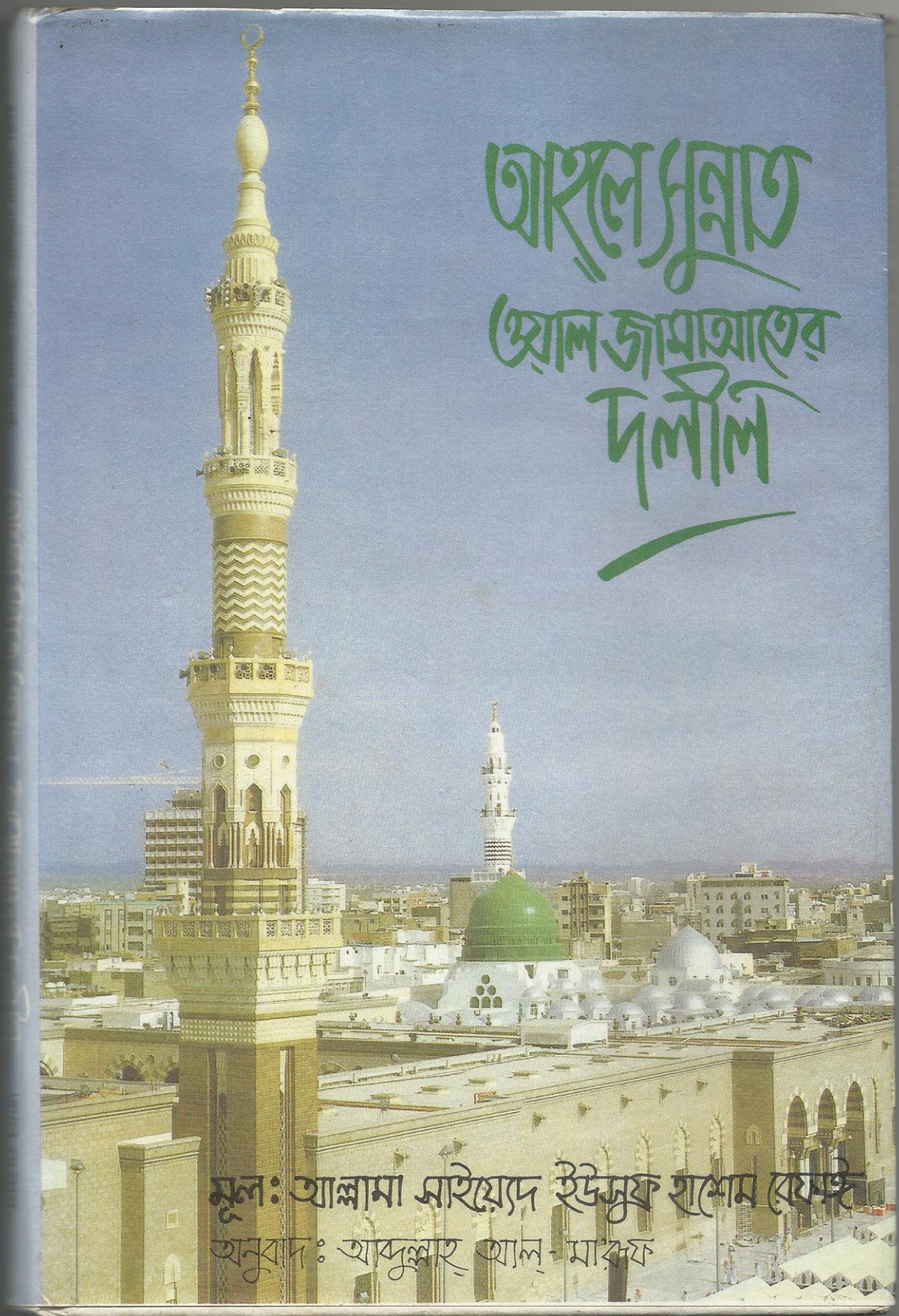

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল-জামাআতের দলীল

মূল: আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ হাশেম রেফাঈ

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ্ আল-মারুফ

First Published, December, 1996

All rights reserved by the translator. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the translator.

Composed by Papyrus International
139, Motijheel C/A, Dhaka, Bangladesh

Printed in Dhaka, Bangladesh
Published by Mrs. Naghma Maruf
for Al-Helal Publication, Dhaka
Phone : 806515, Fax : 02-805350

Available in : Dhaka :
Baitul Mokarram Book Stalls
City library, Banglabazar, Dhaka
Al-helal Publication, Phone : 806515
And all other noted book stalls

Chittagong :
Mohammadi Library, Andorkilla
Phone :
All other noted book stalls in ctg. and whole of the country

Kuwait :
Darul Quran Al-Karim
P. O. Box No. 420
Safat, Al-Mansuria, Kuwait

Price : Tk. 120/- Dollar 6.00, KD. 2.000

"Ahle Sunnat wal Jamater Dalil"—Documents of the Ahle Sunnat wa Al-Jamat— a translation of the book- "Adellatu Ahl-Al-Sunnat wa-Al-Jamat" written in Arabic by His excellency Allama Sayyed Yousuf Al-Sayyed Hashem Al-Refaee, Ex-minister of Kuwait, and Translated into Bengali by Mr. Abdullah Al-Maruf Md. Shah Alam, eminent Alim and writter of the country and Published by Mrs. Naghma Maruf for Al-Helal Publication, Dhaka, Bangladesh

December 1996.

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দলীল

(বিশ্বের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের আকিদা বিশ্বাসগত পরিচয়– তাঁরা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত। তাঁদেরই কিছু আকিদা-বিশ্বাসের প্রামাণিক ভিত্তি বিধৃত হয়েছে নিবিড় গবেষণালব্ধ তত্ব ও তথ্যের এই মূল্যবান সমাবেশে। এতে মক্কা শরীফের বরেণ্য আলেম আল্লামা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলাবী আল্-মালেকীর বিরুদ্ধে সে দেশেরই আরেকজন নজদী আলেম– আব্দুল্লাহ বিন মানী'-এর হামলাকেও সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছে।)

মূল ঃ আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ হাশেম রেফাঈ

অনুবাদ ঃ আব্দুল্লাহ আল্-মা'রূফ মুহাম্মদ শাহ্ আলম

আল্-হেলাল প্রকাশনী, ঢাকা

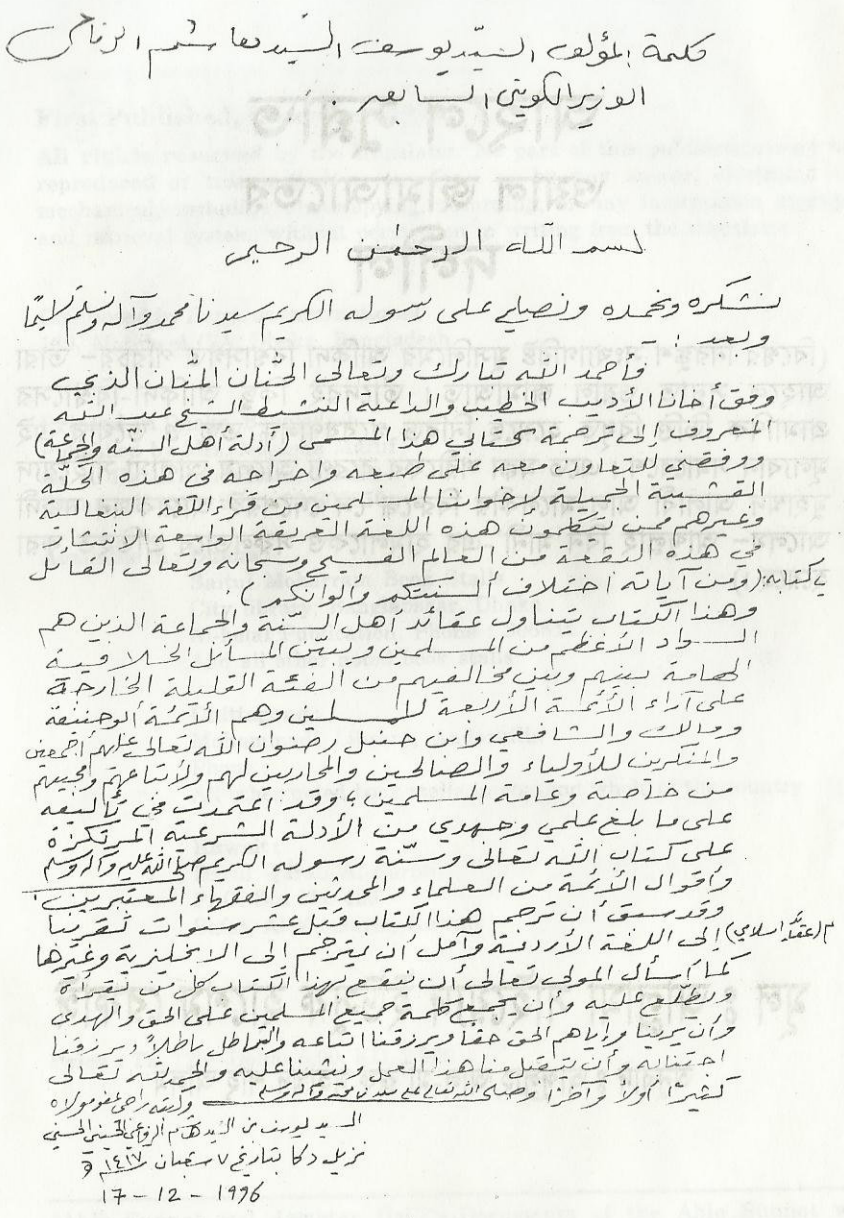

كلمة المؤلف السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي
الوزير الكويتي السابق

بسم الله الرحمن الرحيم

نشكره ونحمده ونصلي على رسوله الكريم سيدنا محمد وآله ونسلم تسليما
وبعد:
فأحمد الله تبارك وتعالى الحنان المنان الذي
وفق أخانا الأديب الخطيب والداعية النشيط الشيخ عبد الله
المعروف إلى ترجمة كتابي هذا المسمى (أدلة أهل السنة والجماعة)
ووفقني للتعاون معه على طبعه وإخراجه في هذه الحلة
القشيبة الجميلة لإخواننا المسلمين من قراء اللغة البنغالية
وغيرهم ممن يتكلمون هذه اللغة العريقة الواسعة الانتشار
في هذه البقعة من العالم الفسيح وسبحانه وتعالى القائل
بكتابه: (ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم)
وهذا الكتاب يتناول عقائد أهل السنة والجماعة الذين هم
السواد الأعظم من المسلمين ويبين المسائل الخلافية
الهامة بينهم وبين مخالفيهم من الفئة القليلة الخارجة
على آراء الأئمة الأربعة للمسلمين وهم الأئمة أبو حنيفة
ومالك والشافعي وابن حنبل رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
والمنكرين للأولياء والصالحين والمحاربين لهم ولأتباعهم ومحبيهم
من خاصة وعامة المسلمين، وقد اعتمدت في تأليفه
على ما بلغ علمي وجهدي من الأدلة الشرعية المرتكزة
على كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم
وأقوال الأئمة من العلماء والمحدثين والفقهاء المعتبرين.
وقد سبق أن ترجم هذا الكتاب قبل عشر سنوات تقريبا
(عقائد إسلامي) إلى اللغة الأردية وآمل أن يترجم إلى الإنجليزية وغيرها
كما أسأل المولى تعالى أن ينفع بهذا الكتاب كل من يقرؤه
ويطلع عليه وأن يجمع كلمة جميع المسلمين على الحق والهدى
وأن يرينا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا
اجتنابه وأن يتقبل منا هذا العمل ويثيبنا عليه والحمد لله تعالى
كثيرا أولا وآخرا وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وسلم
والله راجي عفو مولاه
السيد يوسف بن السيد هاشم الرفاعي الحسني الحسيني
نزيل دكا بتاريخ ٧ شعبان ١٤١٧ هـ
17-12-1996

গ্রন্থকারের বাণী

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

তাঁরই কৃতজ্ঞতা ও প্রশস্তি জ্ঞাপন করছি। তাঁর সম্মানিত রাসূল সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ ও তাঁর বংশধরদের প্রতি নিবেদন করছি যথোপযুক্ত সালাত ও সালাম ।

মহিয়ান গরিয়ান পরম করুণাময় ও দাতা– আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করছি, যিনি আমাদের ভাই সুসাহিত্যিক, বাগ্মী ও কর্মতৎপর ধর্ম-প্রচারক শেখ আব্দুল্লাহ আল্ মারূফ-কে আমার প্রণিত " أدلة أهل السنة والجماعة " শীর্ষক গ্রন্থটি তরজমা করার তৌফিক দিয়েছেন এবং আমাকে তৌফিক দিয়েছেন বইটি আমাদের বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের কাছে এই সুন্দর অঙ্গসজ্জায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তাঁর সহযোগিতা করতে। বইটি এখন বিস্তৃত ভূখণ্ডে হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত এ ভাষায় কথা বলা অন্যান্যদের জন্যও বোধগম্য হবে। তাই তো মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন– ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم –'তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্যও আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন।'

এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে– আহ্‌ল সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস। এতে বিশেষ করে সে সব আপতঃ বিতর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধৃত হয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে চার ইমামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও কিছু ছোটখাট গ্রুপ এ সব নিয়ে বিতর্ক তুলেছে। তারা চার ইমাম– ইমাম আবু হানিফা, মালেক, শাফেঈ ও ইবনে হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাঈন–এর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এবং করে আউলিয়া ও নেককার বোযর্গ লোকদের। বরং তাঁদের ও তাঁদের অনুসারী ও মুহাব্বতকারী বিশিষ্ট ও সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তারা।

আমি এ গ্রন্থ প্রণয়নে আমার জ্ঞান ও সাধ্যমত পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ এবং নেতৃস্থানীয় ও গ্রহণযোগ্য আলেম, হাদীসবেত্তা, ফেকাহ্‌বিদদের অভিমতের উপর ভিত্তিশীল শরীয়তের দলীলের উপর নির্ভর করেছি। ইতোপূর্বে প্রায় দশ বছর আগে উর্দু ভাষায় ইসলামী আকায়েদ শিরোনামে এর অনুবাদ বেরিয়েছে। আশা করি ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষায়ও এর তরজমা বের হবে।

মহান প্রভুর দরবারে প্রার্থনা, তিনি যেন এই গ্রন্থের পাঠকদের এ থেকে উপকৃত করেন এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করেন এবং তাদের ও আমাদের নিকট সত্যকে সত্য হিসেবে প্রতিভাত করেন এবং তা অনুসরণের তৌফিক দেন আর অসত্যকে অসত্য হিসেবে প্রতিভাত করেন এবং তা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দেন। তিনি যেন আমাদের এই কাজটিকে কবুল করেন এবং এর উপর আমাদের প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর অজস্র প্রশংসা মহান আল্লাহরই জন্য– প্রথমেও শেষেও। মহান আল্লাহর সালাত ও সালাম নিবেদিত হোক সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ ও তাঁর 'আ-ল'-এর প্রতি।

লিখলাম–

প্রভুর ক্ষমা প্রত্যাশী–

সাইয়্যেদ ইউসুফ ইবনে সাইয়্যেদ হাশেম আর-রেফাঈ

আল-হাসানী ওয়াল হুসাইনী

অনুবাদিত

ঢাকার মেহমান। তাং- ৭ শা'বান ১৪১৭ হিঃ ১৭-১২-১৯৯৬ ইং

মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম
প্রতিমন্ত্রী
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Moulana Md. Nurul Islam
STATE MINISTER
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Fax : 880-2-865040

বাণী

আমাদের ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ কুয়েতের প্রাক্তন মন্ত্রী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুসলিম বিশ্বের বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ রেফাঈ প্রণীত গ্রন্থ- "أدلة أهل السنة والجماعة"-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেম ও লেখক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল্-মা'রূফ (উপ-পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) বইটির অনুবাদ করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইসলামী আকিদা ও বিশ্বাসের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে তিনি তাঁর বইটিতে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন, যা দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের জন্য যথেষ্ট দিক নির্দেশনা দিবে বলে আমি মনে করি। এতে আমরা ইসলামী জ্ঞান, সংস্কৃতি ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে একে অন্যের সম্পূরক শক্তি হিসেবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হব বলে মনে করি।

আমি গ্রন্থকার ও অনুবাদকের দীর্ঘায়ূ কামনা করি।

(মাওলানা মোঃ নূরুল ইসলাম)
প্রতিমন্ত্রী

জাতিসংঘে নিয়োজিত দায়েমী কমপ্লেক্স বাংলাদেশ-এর স্থায়ী প্রতিনিধি
ও নিউইয়র্ক ভিত্তিক বিশ্ব আধ্যাত্মিক পরিষদ-এর সভাপতি
শাহ্ সূফী নূরুল আলম-এর

অভিমত

আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ রেফাঈ একজন বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক নেতা। তাঁর পান্ডিত্য ও মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণ কামনায় তাঁর কর্মতৎপরতাও সুবিধিত। বিশেষ করে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জমাআতের আকিদার প্রচার ও প্রসার তথা এর সুরক্ষায় তাঁর মূল্যবান অবদান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কিছু অতি উৎসাহী নজদী আলেমের অব্যাহত সুন্নী আকীদাবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে সাইয়্যেদ রেফাঈ "أدلة أهل السنة والجماعة" শীর্ষক যে বহুল আলোচিত গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাঁর বাংলা অনুবাদ হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত। এতে প্রমাণিত হলো যে সহীহ আকিদা বিশ্বাস দেশে দেশে একই ধারায় প্রবাহিত। কেবল বাতিল আকিদাগুলো মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিতে চায়। বাংলাভাষাভাষী মুসলমানদের সহীহ আকীদা হেফাযতে এ গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আরবী ভাষায় বিরচিত এ গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন দেশের বিশিষ্ট আলেম, আরবীবিদ ও সাহিত্যিক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-মারূফ মুহাম্মদ শাহ আলম। ইনি অনুবাদ কাজে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পারঙ্গমতাকে কাজে লাগিয়েছেন সুনিপুনভাবে। অনুবাদটি পড়তে মূলের মতই লাগে। আকিদার প্রামাণিক বিশ্লেষণে পবিত্র কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে যে ধরনের জ্ঞান ও আকিদা সচেতনতা এবং ভাষাগত দখল প্রয়োজন অনুবাদকের তা রয়েছে বলে আমি মনে করি।

এদেশের হাজার বছরের লালিত অনেক ইসলামী আকীদা বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে একশ্রেণীর ফতোয়াবাজরা না বুঝে শিরক বিদ্‌আত বলে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে, এ সময় এ ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশ খুবই গুরুত্বহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। সহীদ আকীদা বিশ্বাসে সজীব হয়ে আধ্যাত্মিক চেতনায় ইসলামী উম্মাহ্ আবার বলীয়ান হবে, ফিরিয়ে আনবে হারানো গৌরব, সে প্রত্যাশায় আমি এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

(শাহ্ সূফী এম, এন, আলম)

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক-এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

আমার প্রিয় ছাত্র, মেধাবী আলেম ও তরুণ সাহিত্যিক জনাব আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ 'আহলে সুন্নাতে ওয়াল জামাআতের দলীল' শিরনামে "أدلة أهل السنة والجماعة" শীর্ষক আরবী মূল গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করছেন জেনে আমি আনন্দিত। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এটি একটি বিশিষ্ট খেদমত। মূল গ্রন্থকার ইসলামী বিশ্বের এজন নেতৃস্থানীয় আলেম। তিনি তাঁর নিরলস কর্মতৎপরতার জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী। ইসলামী আকীদার কয়েকটি বিশেষ দিক সম্পর্কে তিনি নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে তথ্যবহুল দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। গ্রন্থটির একটি বিশেষ গবেষণা মূল্য রয়েছে। এটি আরবী, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় বহুবার প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় গ্রন্থাকারে এই প্রথম। আকিদা বিশ্বাসের জটিল তাত্বিক বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ এই গ্রন্থটির অনুবাদটি বেশ ঝরঝরে ও সুখপাঠ্য হয়েছে অনুবাদকের এ কাজে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার গুণে। মূল গ্রন্থের কবিতাগুলো বাংলায় কাব্যানুবাদ করে অনুবাদক তার কাব্যিক শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন।

আমি আশা করি আরবী ভাষায় প্রণীত এ মূল্যবান গ্রন্থটি এখন বাংলাভাষীদের ইসলামী জ্ঞান ভাণ্ডারে অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার প্রত্যাশা করি।

(ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক)

ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব-এর

অভিমত

আলমে ইসলামীর যুগ শ্রেষ্ঠ আলেম ও অবিসংবাদিত নেতা এবং আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এর বংশধর হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ ইউসুফ রেফাঈ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার অতন্দ্র প্রহরী হওয়ার প্রেক্ষিতে সৌদি আরবের এক নজদী লেখকের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার মহান উদ্দেশ্যে যে গ্রন্থ "أدلة أهل السنة والجماعة" রচনা করেন, তা কতগুলো সুন্নী আকীদার ব্যাপারে কিছু বিভ্রান্ত লোকের সংশয়কেও অপনোদন করে সেগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। ইমাম আহমাদ রেদা খান বেরলবী (রঃ) যেমনি তার যুগে বাতেল ফের্কার জন্য এক নাঙ্গা তলোয়ার ছিলেন, একই ধারায় বর্তমান যুগে ইসলামী জগতে আকীদার সুরক্ষায় আল্লামা রেফাঈর এ প্রচেষ্টা যুগের যোগ্য প্রতিনিধিত্ব। এতে এও প্রমাণিত হয় যে, সহীহ আকীদা তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস দেশে দেশে এক ও অভিন্ন।

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মারূফ এই অমূল্য গ্রন্থটি আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে দেশ ও জাতির বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি এ ধরনের অনুবাদ কাজের জন্য যোগ্য ব্যক্তি। তিনি জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কৃতি ছাত্র ও দেশের বিশিষ্ট আলেম। আরবী ও বাংলায় সমান পারদর্শিতার অধিকারী হওয়াতেই তাঁর অনুবাদটি হয়ে উঠেছে প্রাঞ্জল, ঝরঝরে ও মৌলিক সাহিত্যের ব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতিশীল আলেম ও লেখক থেকে কওম ও মিল্লাত আরো অনেক কিছু আশা করে।

আমি এই অনুবাদ কর্মটির বহুল প্রচার কামনা করি।

– কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী

অনুবাদকের কথা

প্রশংসা সব আল্লাহর। সালাত ও সালাম নবীজীর প্রতি। তাঁর পবিত্র 'আ-ল'-এর প্রতি। তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের প্রতি এবং এ সাথে আমাদের সকলের প্রতি।

মহান আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে أدلة أهل السنة والجماعة গ্রন্থটির অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হলাম। দেশে ও বিদেশে আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, মুসলিম বিশ্বের গণমানুষ সাধারণভাবে আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর মত অনুসারী। কিন্তু তারা ঈমানের তফসীল সম্পর্কে তত সচেতন নন। তবে আলেমদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবশ্য আকীদা সম্পর্কে সচেতন আছেন। কিন্তু সাধারণ লোকের এই সহজ-সরলতার সুযোগে ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু মহল অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয়েও অযথা বিতর্ক সৃষ্টি করে ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বে ফাটল সৃষ্টি করে। জীবন শেষ হয়ে যায় তবুও কোন কোন বিষয়ে আমরা সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকি। এ প্রেক্ষিতে আমাদের বক্ষমান গ্রন্থকার যে তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষনের মাধ্যমে কিছু বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এটি আমাদের সিদ্ধান্তহীনতা ঘোচাতে সহায়ক হবে। গ্রন্থকার মুসলিম জাহানের এক অবিসংবাদিত নেতা ও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সংখ্যালঘু মুসলমানদের এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর কর্মবহুল জীবনে তিনি দেশে দেশে বহু ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তাঁদের দিয়েছেন আর্থিক, আত্মিক ও নৈতিক সহায়তা। ইসলামী দুনিয়ায় এ সমস্যা বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে একক নেতৃত্ব ও দিক নির্দেশনা দেওয়ার যে শূন্যতা বিরাজ করছে তা পূরণে সক্ষম ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমরা তাঁকেই পাই। তিনি মহান সাধক আহমাদ কবীর রেফাঈর যোগ্য উত্তরসূরী এবং সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর এক আদর্শ স্থানীয় বংশধর। কুয়েতে এবং বাংলাদেশে আমি তাঁর যথেষ্ঠ সাহচর্য পেয়েছি। আমার পর্যবেক্ষণে তাঁর আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মতৎপরতা ইত্যাদি বার বার আমাকে মহানবী (দঃ) এর পবিত্র সীরাত মনে করিয়ে দেয়। তাঁর মধ্যে আমি পেয়েছি উদারতা, সহিষ্ণুতা, ভদ্রতা ও নির্ভীকতার অনুপম আদর্শ। আর সেজন্যেই তিনি নজদী আলেমদের তীব্র আক্রমণের মুখেও নিজেকে রেখেছেন সংযত। ভদ্রতা ও যুক্তির আলোকেই তিনি তাদের মোকাবেলা করেছেন। চুপ থাকেন নি, আবার সীমা অতিক্রমও করেন নি। এজন্যই তাঁর এ গ্রন্থটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়েছে।

সাইয়্যেদ রেফাঈ আমাকে তাঁর গ্রন্থটি অনুবাদ করার জন্য ৩/৪ বছর যাবত চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা ছিল আমার তরজমার প্রতি তাঁর আস্থাও আমার প্রতি তাঁর স্নেহের দাবী। ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক হিসেবে খাগড়াছড়ি যাওয়ার পর এ সুযোগ হলো। কাজের ঝামেলা যখন ক্লান্ত হয়ে ঘুমাতো আমি তখন নিজেকে নির্ঘুম রেখে হাজী দোস্ত মোহাম্মদ চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে আমার কক্ষে এর অনুবাদ কাজ চালিয়ে গেছি।

অনুবাদ বড় শক্ত কাজ। অন্যকে নিজের কলমে আমানতদারীর সাথে তুলে ধরতে হয়।

তবু বারবার সন্দেহ তাড়া করে ফিরতে চায়। অবশেষে একটি যথাশব্দ পরিতৃপ্তি দেয়। আকীদার গ্রন্থ তরজমা করা আরো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবুও আমি আশা করি আমি আমার সাধ্যের চূড়ান্ত কাজে লাগিয়েছি। আমার ভাষাকে সুন্দর করতে গিয়ে তরজমায় অবিশ্বস্ত হই নি। এর ভালমন্দ বিজ্ঞ পাঠকই বিচার করবেন। যদি কোন দুর্বলতা থাকে, সেটা আমার। যদি কোন কিছু ভাল লাগার মত থাকে তা গ্রন্থকারের প্রাপ্য। এখানে আমার কোন অস্তিত্ব রাখতে চাইনি। আমি শুধু গ্রন্থকারের একটি ছায়ামাত্র।

এ গ্রন্থটি অনুবাদের কাজে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন শ্রদ্ধেয় হুজুর শেখ মানযূর আহমাদ, পীর সাহেব, ফরাযীকান্দী ও আমীরে আ'লা, নেদায়ে ইসলাম। এই আশেকে রাসূলকেই উৎসর্গ করেছি এই গ্রন্থখানি।

যাঁরা অনুবাদিত গ্রন্থটির জন্য বাণী ও অভিমত দিয়েছেন আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি প্রকাশে প্রকাশিকা বেগম নাগমা মা'রূফ-এর আগ্রহ ও সহযোগিতার জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। গ্রন্থটির অনুবাদ ও প্রকাশে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়েছেন আমি তাদের সবাইকেও দোয়া করি।

এই গ্রন্থটি আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত-এর একটি প্রামাণ্য মুখপত্র হিসেবে সমাদৃত হবে এ প্রত্যাশা পোষণ করছি। আল্লাহ্ তায়ালা যেন এই আমলটিকে গ্রহণ করেন। আমীন!

– আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রূফ

– অনুবাদক

উৎসর্গ

একজন পীর, তবে সমাজ বিমুখ নন
একজন সমাজকর্মী, তবে প্রচারবিমুখ নন
একজন আলেম– একজন আশেকে রাসূল–
শেখ মানযূর আহমাদ ছাহেব-এর
দস্ত মোবারকে

সূচীপত্র

গ্রন্থকারের বাণী
মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর বাণী
শাহ্ সুফী মোঃ নূরুল আলম-এর অভিমত
অধ্যাপক ডঃ মোঃ আবু বকর সিদ্দিক-এর অভিমত
ইমামে আহলে সুন্নাত কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী-এর অভিমত
অনুবাদকের নিবেদন
গ্রন্থকারের ভূমিকা ১

প্রথম অধ্যায় ঃ ৭
- যুক্তির ভাষায় কথা বলা আমাদের মহান পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য ৭
- শেখ জাযায়েরীর ভূমিকা ৯
- শেখ তুওয়াইজেরীর ভূমিকা ১০
- সাইয়্যেদ মালেকীর ব্যাপারে ইবনে মানী-এর সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য? ১৩
- বংশের উপর কটাক্ষ করা কবীরা গুনাহ ১৪

- দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ১৬
- হেওয়ার-এর জবাব ১৬

- আদম (আঃ) এর সৃষ্টির মূল কারণ ১৬
- খোদাদাদ এই সম্মানের কিছু দৃষ্টান্ত ২২
- নবী মুহাম্মদ (দঃ) এর সাথে আল্লাহর পরামর্শ ২৫

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ২৭
- মহানবী (দঃ) ও অদৃশ্য জ্ঞান ২৭
- পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণের সুষ্ঠু পদ্ধতি ২৮
- পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর ইলমে গায়েব-এর প্রমাণ ২৯
- পবিত্র হাদীসে মহানবী (দঃ) এর অদৃশ্য জ্ঞানের প্রমাণ ৩০
- আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজীর ইল্‌মে গায়েব আছে বললে তিনি কারো সে কথা অস্বীকার করেন নি ৩১
- আরেকটু বিশ্লেষণ ৩২
- লওহ ও কলমের জ্ঞান ৩৩
- 'পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না' –এ আয়াত ও হাদীসকে কিভাবে বুঝতে পারি ৩৪

- মায়ের উদরে কি আছে তা তাঁকে জানানো হয়েছে ৩৫
- বৃষ্টি বর্ষণের জ্ঞানও ছিল ৩৭
- অন্যান্য গায়েবী সাক্ষ্য ৩৭
- গায়েবী বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত সার ৪৬
- গায়েবের চাবি ও ঐ পাঁচটি বিষয় ৪৯
- কেয়ামত ৫১
- রূহ ৫২

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ৫৩
- সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (দঃ) এর উচ্চ মর্যাদা ৫৩
- তিনিই প্রথম সুপারেশকারী ৫৪
- তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণের সময় তাঁকে সম্মান করা প্রসঙ্গে ৫৫
- এই শ্রেষ্ঠত্বের যোগ্যতা ও অধিকার ৫৭
- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সালাতের ভাষা ৬৮
- "সাইয়্যেদুনা" সম্বোধনের আরো কিছু দলীল ৭১

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ৭৩
নবী করীম (দঃ) এর শক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন সন্দেহভঞ্জন ৭৩
- অর্গলমুক্তির সালাত ৭৩
- সব কিছু তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট ৭৫
- তাঁর দ্বারা গিঁট খুলে যায়, বিপদ দূর হয় ৭৬
- একত্ব ও একত্ববাদ ৮০

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ৮৩
- তাবারুক কোন শিরক বা বিদআত নয় ৮৩
- বাই'আত রেদওয়ান বৃক্ষ ৮৩
- বাই'আত বৃক্ষ কাটার কারণ ৮৩
- বরকতময় নিদর্শনের উদ্দেশ্যে গমণ ৮৩
- বুযর্গব্যক্তিদের নিদর্শনাদির বরকত গ্রহণ ৮৪

সপ্তম অধ্যায় ঃ তাওয়াস্সুল ৮৭
- ওসীলার প্রকারভেদ ৮৮
- অন্ধের হাদীস ও মৃত ব্যক্তিদের ওসীলা ধরা ৮৮
- অন্ধের হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে বিশ্লেষণ ৯০
- আব্বাসকে সাহাবীরা ওসীলা ধরা প্রসঙ্গে ৯২
- তাওয়াস্সুল সম্পর্কে আমাদের আকীদঅ ৯৪

- দেহত্যাগের পর আত্মার অবস্থা ১০২
- কবরে প্রশ্ন ১০৩

অষ্টম অধ্যায়ঃ ১০৫
- কিছু সন্দেহ ওঞ্জন ১০৫
- সৌভাগ্যবান সে, যে তাঁকে দেখেছে ১০৫
- ইজমা' কোথায়? ১০৬
- রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর পবিত্র পাদুকা ১১০
- মীলাদ রজনী ও কদর রজনী ১১৪
- যোগ্য প্রাপকদের নবীজী কর্তৃক বেহেশতের প্লট বরাদ্দ ১১৫
- আসমান জমিনের চাবিকাঠি ১১৮
- কবর শরীফ ও কা'বা শরীফ ১২০
- ইবনুল কাইয়্যেম ও আলে বাইতের মর্যাদা ১২১
- সাইয়্যেদুনা রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর নিকট কৃতকর্ম-বিবরনী পেশ ১২৪
- কবরবাসী আত্মীয় পরিজনের নিকট জীবিতদের আমল উপস্থাপন ১৩৩

নবম অধ্যায় ঃ সুন্নাত ও বিদ্আতের সঠিক পরিচয় ১৩৫
- অভিনব কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (দঃ) এর সুন্নাত কী, এ বিষয়ে কিছু প্রামাণিক দলীল ১৪০
- ইমাম শাতবীর অভিমতের ব্যাখ্যা ১৭২

দশম অধ্যায়ঃ
- মীলাদুন্নবী (দঃ) উদযাপনকে অস্বীকারকারীদের প্রতি জবাব ১৭৬
- দ্বীন ও বিদ্আত ১৭৭
- মানদন্ড কি? ১৮০
- মীলাদ শরীফ বিদ্আত নয় ১৮১
- উপসংহার ১৮৩
- গ্রন্থপঞ্জি ১৮৪

الفصل التاسع
নবম অধ্যায়

সুন্নাত ও বিদ্আতের সঠিক পরিচয়

এ বইয়ের ভূমিকায় আমি আপনাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, একটি আলাদা অধ্যায়ে আমি সুন্নাত ও বিদআত সম্পর্কে আলোচনা করব। কারণ, সুন্নাত ও বিদ্আত ও পবিত্র হাদীসসমূহের যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই এ সব গোধূলীর সৃষ্টি হয়েছে যা তাওহীদবাদী ও এক কেবলামুখী মুসলমানদের গায়ে বেদআত, শের্ক, কুফর ফতোয়ার আভরণ এঁটে দিচ্ছে। যেমনটি করছেন জনাব ইবনে মানী ও জনাব তুওয়াইজেরী বিশেষ করে এবং তাদের সহযোগীরা সাধারণভাবে। এজন্যই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ গ্রন্থে এ বিতর্কিত ভয়ঙ্কর বিষয়টি নিয়ে একটি মূল্যবান অধ্যায়/পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করব যার পাণ্ডুলিপি পেয়ে গ্রহণও করেছি। এর প্রণেতা জনাব আব্দুল্লাহ্ বিন মাহ্ফুয বা'লাবী আল্-হুসাইনী আল্ হাদরামী, সাবেক প্রধান বিচারপতি, শরীয়তী বিচার বিভাগ, হাদ্রামাউত। আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন তাঁকে এটা পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করার তৌফিক দিন। আমি সেখান থেকে কয়েকটি প্যারা মাত্র চয়ন করেছি, এতে আল্লাহ চাহেন তো প্রভূত কল্যাণ রয়েছে –'তাঁদেরই জন্য যাদের রয়েছে হৃদয়ের মত হৃদয় এবং যারা শ্রবণেন্দ্রীয় উৎকর্ণ রেখেছেন এবং স্বয়ং নিবিড়ভাবে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছেন।'

সুন্নাত ও বিদআত

শরীয়তের প্রবর্তক (দ:) এর ভাষায় সুন্নাত ও বিদআত দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়। একটিকে বুঝতে হলে অন্যটিকে সনাক্ত করতে হবে। দুটি বিপরীতধর্মী বিষয় বটে। (কথায় বলে–উল্টো দিয়ে সিধে চেনা যায়) দেদার লেখক সুন্নাতের সংজ্ঞা নিরূপন না করেই বেদআতের সংজ্ঞায়নের পথ ধরেছেন। অথচ মৌল বিষয় হলো-সুন্নাত। এতে তারা এমন সংকীর্ণ গলি পথে পা বাড়িয়েছেন যা থেকে বের হয়ে আসা সম্ভব হয় নি এবং এমন কিছু দলীল-প্রমাণের সাথে সংঘর্ষ বাধিয়েছেন যা বেদআতের ঐ সংজ্ঞায়নকে নাকচ করে দেয়। যদি তারা প্রথমেই সুন্নাতের সংজ্ঞা নিরূপনে সচেষ্ট হতেন তাহলে তারা এমন কিছু সঠিক সূত্র বের করতে পারতেন যার পরে আর বিতর্ক হতো না।

রাসূলুল্লাহ্ (দ:) প্রথমত: সুন্নাতের প্রতি উদ্দীপ্ত করেছেন। তারপর এর বিপরীতটি সম্পর্কে সর্তক করেছেন। যেমনটি আপনারা এ হাদীসগুলোতে প্রত্যক্ষ করবেন:

১। মুসলিম এর সঙ্কলনে জাবেরের হাদীস: রাসূলুল্লাহ (দ:) যখন ভাষণ দিতেন, তাঁর দু চোখ তখন লাল হয়ে যেতো এবং কণ্ঠ উচ্চগ্রামে চলে যেতো এবং বলতেন: যাক, উত্তম বাণী হলো আল্লাহ্‌র কিতাব, উত্তম হেদায়েত তো মুহাম্মদ (দ:) এর হেদায়েত, সবচেয়ে খারাপ বিষয় হলো বানোয়াট বিষয়। প্রতিটি বানোয়াটই হচ্ছে বিদ্‌আত, আর সব বিদ্‌আতই ভ্রষ্টতা। এটি বুখারী সাহেব ইব্‌ন মাসউদ পর্যন্ত উদ্ধৃতি দিয়ে মওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেন।

২। এটিকে স্পষ্ট করছে আবু দাউদ ও তিরমিযী সঙ্কলিত এরবাদের হাদীস। তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইব্‌ন মা-জাহ ও অন্যান্যরাও বর্ণনা করেছেন:

আমাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এক প্রাঞ্জল ভাষণ দেন যাতে হৃদয় কেঁপে কেঁপে উঠেছে, নয়নে বারি ঝরেছে। তখন আমরা বলল ম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ যেন বিদায়ের ভাষণ। তখন তিনি আমাদের কি উপদেশ দিলেন-তোমাদের আমি খোদাভীতির উপদেশ দিয়ে যাই, যদি তোমাদের আমীর একজন হাবশী কৃতদাসও হয় তার কথা শুনবে ও মানবে। কারণ, আমার পরে যারা বেঁচে থাকবে তারা অচিরেই অনেক মতানৈক্য দেখতে পাবে। এ সময় তোমরা আমার আদর্শ ও সঠিক খলীফাদের আদর্শ মেনে চলবে, যদি দাঁত দিয়ে আঙ্গুলও কামড়াতে হয়। খবরদার নতুন নতুন উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, সব বিদআতই গোমরাহী।

৩। মুসলিমের বর্ণনায় হাদীসে জাবেরও বিষয়টি স্পষ্ট করছে- যিনি ইসলামে কোন উত্তম সুন্নত (আদর্শ পন্থা) এর প্রচলন করেন তাঁর জন্য রয়েছে তার পূণ্য এবং যারা তারপরে সে মোতাবেক আমল করবে তাদের সমান পূণ্য, অথচ আমলকারীদের পূণ্যে ঘাটতি হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে খারাপ আদর্শ/পন্থার প্রচলন করবে তার জন্য সেই পাপ ও যারা তারপরে সে কাজ করবে তাদের পাপ অবধারিত, অথচ অনুসারীদের পাপে কিছুমাত্র কম করা হবে না।

এধরনের আরো বহু হাদীস রয়েছে যা একই মর্ম প্রকাশ করে। যেমন মুসলিম সঙ্কলিত ইবনে মাসউদের হাদীস-

من دل على خير فله مثل اجر فاعله –'যিনি কোন ভাল কাজের সন্ধান দেবেন তিনি ঐ কাজ বাস্তবায়নকারীর সমান পূণ্য লাভ করবেন।'

মুসলিম সঙ্কলিত আবু হোরায়ার হাদীস:

من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شئى ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم.

"যে হেদায়াতের পথে আহবান করবে তার জন্য ঐ কাজের অনুসারীর সমান পূণ্য রয়েছে, অথচ ঐ ব্যক্তির পূণ্যে একটুও কম করা হবে না। আর যে কোন গোমরাহীর পথে আহ্‌বান করবে তার জন্য রয়েছে সমপরিমাণ পাপ..... ।'

লক্ষ্য করুন, প্রথম হাদীসে بدعة ও محدثة এর বিপরীতে নবীজীর হেদায়াতকে রাখা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর হেদায়াত তো উত্তম হেদায়াত আর নব উদ্ভাবিতের মধ্যে খারাপ হলো যা তার হেদায়েতের বিপরীত-সেটাই বিদ্‌আত।

হাদীসে এই বৈপরিত্য সুস্পষ্ট- তোমরা অনুসরণ করবে আমার সুন্নাত.... । আর তোমরা নব উদ্ভাবিত বিষয়াবলী থেকে সাবধান থেকো। কারণ, সব নব উদ্ভাবিতই বিদ্‌আত। আবার তৃতীয় হাদীসে ভাল সুন্নাত (পন্থা) খারাপ সুন্নাত (পন্থা) এর বিপরীতে এসেছে। (من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة) কাজেই প্রথমে হচ্ছে সুন্নাত। কারণ সেটাই মূল। যা তা থেকে বিচ্যুত হবে সেটিই বিদ্‌আত। এখন দেখা যাক, সুন্নাত কাকে বলে, যা এরবাদের হাদীসে এসেছে– যার বিপরীতে ঐ হাদীসে বিদ্‌আকে রাখা হয়েছে।

সুন্নাত (السنة) আরবদের ভাষা ও শরীয়তের ভাষ্যে- তরীকা (পন্থা/পদ্ধতি), সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর দিক নির্দেশনা (هدى)। এটা জাবেরের হাদীসে এসেছে। এ অর্থেই রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর বাণী:

لتتبعن سنن من قبلكم اى طريقهم

–'তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের সুন্নাতের অনুসুরণ করবে অর্থাৎ তাদের তরীকা বা পদ্ধতির। এটা সুপ্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস। যেমন রাসূলুল্লাহ (দ:) এর বাণী –من سن فى الاسلام سنة حسنة الخ (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভাল কোন তরীকা বা পন্থা উদ্ভাবন করবে...)। যেমনটি ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

কাজেই হেদায়াত গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর তরীকাই হলো সুন্নাত। সেটা হাদীসে জাবেরেরও বাখ্যা : সুন্নাতে হাসানাহ্, সুন্নাতে সাইয়্যেয়াহ অর্থাৎ ভাল তরীকা, খারাপ তরীকা (পন্থা)। এছাড়া অন্য কিছুর অবকাশ রাখে না। কাজেই এর অর্থ তা নয় যা সাধারণ ছাত্ররা করে থাকে, পাবলিকের কথা বাদই দিলাম। এটা তো নবীজীর হাদীস। প্রথমটি মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষা, দ্বিতীয়টি ফকীহ্ ও উসূলীনদের। উভয়টিই উদ্ভাবিত যা এখানে প্রযোজ্য নয়। বরং রাসূলের সুন্নাত হলো- কর্ম, নির্দেশ ও বর্জনে তাঁর পদ্ধতি। সেটাই তার খলীফাদের আদর্শ বা পদ্ধতি যা তারা কর্ম, নির্দেশ, গ্রহণ ও বর্জনে অনুসরণ করেছেন।

কাজেই কোন কিছু হলে তাকে আমরা পবিত্র সুন্নাহর চাঁছে ফেলে এর তরীকা অনুযায়ী গ্রহণ বা বর্জন করব। রাগেব আল ইস্‌পাহানী তাঁর 'মুফরবাদাত আল কুরআন-এ সুনান (سنن) শব্দমূলের আলোচনায় ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলেন–

فالسنن جمع سنة وسنة الوجه طريقته وسنة النبى صلى الله عليه وسلم طريقته التى كان يتحراها و سنة الله تعالى قد تقال الطريقة حكمته وطريقه وطاعته .....

–'সুনান শব্দটি 'সুন্নাত' এর বহুবচন। আর কোন কিছুর (الوجه) সুন্নাত মানে এর নিয়ম পদ্ধতি। আর রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাত মানে ঐ পদ্ধতি বা নিয়ম যা তিনি নিজে চিন্তা করে বের করেছেন। আর আল্লাহ্‌র সুন্নাত মানে তার কৌশল-পদ্ধতি বা তার প্রতি আনুগত্যের নিয়ম-প্রণালী। যেমন পবিত্র কুরআনের ভাষায়- سنة الله التى قد خلت من قبل –'আল্লাহ্‌র সেই অমোঘ সুন্নাতকে অনুসরণ কর, যা তোমাদের পূর্বেই অনুসৃত হয়েছে। فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا –'কাজেই আল্লাহ্‌র সুন্নাত (অমোঘ বিধান) এর মধ্যে কোন পরিবর্তনই পাবে না। এমনকি আল্লাহ্‌র নিয়েমের (বা সুন্নাতের) মধ্যে কোনই মোড় পরিবর্তন পাবে না।'

শরীয়তের শাখা-প্রশাখা যদিও বাহ্যিকভাবে ভিন্ন হয়ে থাকে কিন্তু এতে এ সত্যটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এসবের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন, এর মধ্যে কোন পরিবর্তন বা রূপান্তর নেই। আর তা হচ্ছে মনকে পবিত্র করা এবং একে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাতে আল্লাহ্‌র সওয়াব ও সান্নিধ্য লাভ হয়।

হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ্ তার الاقتضاء (আল্-একতেদা) গ্রন্থে বলেছেন:

জাহেলী যুগের সুন্নাত হলো- যেসব আচার আচরণে তারা অভ্যস্ত ছিল। কারণ, এ সব সুন্নাত তো আসলে আদত অভ্যাসেরই নাম। এটা বস্তুত: সে সব জীবনাচার বা নিয়মকানূন যা বিভিন্ন প্রকার মানুষকে শামিল করার নিমিত্ত পুনরাবৃত্ত হয়–চাই বিষয়টিকে তারা ইবাদত হিসেবে গণ্য করুক বা না করুক। (পৃ: ৭৬)

হাফেয ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে ফিতরত তথা ফিতরতের বৈশিষ্টের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন: হাদীসের কিছ বর্ণনায় ফিতরতের স্থলে সুন্নাহ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। তখন এর অর্থ হলো তরীকা বা পদ্ধতি। ওয়াজেব এর বিপরীতে সুন্নাতের যে অর্থ, তা নয়। আবু হামেদ ও মাওয়ারদী প্রমূখ দৃঢ়তার সাথে এ অভিমত পোষণ করেন। তারা বলেছেন, অন্য এক হাদীসের ভাষ্য এ অর্থই ব্যক্ত করে– عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الرشدين الخ –'তোমরা আমার সুন্নাত ও খোলাফায়ে রাশেদীন এর সুন্নাত (অর্থাৎ তরীকা) মেনে চলো..।

কাজেই যখন উপরোক্ত দলীল প্রমাণ ও উদ্ধৃতির আলোকে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বিদআতের বিপরীতে যে সুন্নাত এর কথা বলেছেন তার অর্থ তরীকা বা পদ্ধতি তখন আমাদের জানতে হবে– রাসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর জামানায় যে সব নতুন বিষয়াবলীর অবতারণা হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর সুন্নাত কি ছিল, বিশেষ করে যে সব বিষয়ে তাঁর (দ:) কোন কর্ম, বাণী বা সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছিল না, বরং যে গবেষণা করেছে সে-ই বুঝেছে এবং এভাবেই তারা আমল করেছিল। এবং আমাদেরকে তাদেরই অনুসরণ করতে হচ্ছে। যাতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর তরীকা বা নিয়ম পদ্ধতি জানতে পারি– তিনি কি গ্রহণ করেছেন নাকি বর্জন করেছেন। এই যে অনুসরণ এটা

আমাদেরকে তার সুন্নাত সম্পর্কে একটি নিশ্চিত নির্দেশনা দিবে, বিশেষ করে ঐ সব ব্যাপারে যা তাঁর পরে কল্যাণকর হিসেবে ঘটবে। কাজেই যেটা তাঁর সুন্নাতের সাথে মিল খাবে সেটিই তাঁর সুন্নাত হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যেটা তাঁর সুন্নাত ও নির্দেশনা থেকে ভিন্ন ও বেমিল হবে সেটিই বিদআত হবে। ঠিক এ কথাই তাঁর (দ:) পবিত্র বাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত–

من دعا إلى هدى ومن دعا الى خير ومن دعا الى ضلالة ...

–'যে হেদায়েতের দিকে ডাকবে, আর যে কল্যাণের দিকে আহবান করবে আর যে গোমরাহীর দিকে ডাকবে...। যা বিভিন্ন সহীহ হাদীসে ইতোপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

আমরা জানতে পারব, কি আমাদের অবশ্যই গ্রহণীয় আর কি অবশ্যই বর্জনীয়। এবং আমাদের কাছে অচিরেই সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে কোনটি সুন্নাহ্ আর কোনটি বিদ্‌আহ্।

এরপর আমরা আলোচনা করব, খলীফাদের যমানায় কি কি নতুন ঘটেছিল। যাতে আমরা তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারব। অনুরূপভাবে কিছু চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব, যা রাসূলুল্লাহ (দ:) প্রত্যাখান করেছিলেন।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ (দ:) নিরবে অনুমোদন করেছেন তা-ই সুন্নাত। কারণ, তিনি তা বহাল রেখেছেন। আমরা বলব, হ্যাঁ, ঠিক তাই। সন্দেহ নেই। কিন্তু তাও আমাদেরকে সুন্নাতে রাসূল বোঝানোর একটি নির্দেশক দলিল এবং গ্রহণ করার পদ্ধতির একটি প্রমাণ। কারণ, এমন বহু কিছুই তো তিনি অনুমোদন করেছেন যা সুন্নাত হয় নি। এমনকি কেউ সেগুলোকে সুন্নাত বলেও নি।

কারণ, রাসূলুল্লাহ (দ:) এর আমল অবশ্যই উত্তম ও অনুসরণের জন্য সবচে' বেশী নির্ভরযোগ্য। কিন্তু এটা আমাদের এ সুস্পষ্ট ধারণাও দেয় যে, তিনি এমন কোন কল্যাণকর জিনিষকে প্রত্যাখান করবেন না যতক্ষণনা তা কোন সুস্পষ্ট দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক হয় অথবা এতে কোন ক্ষতি হতে পারে বা তাঁর (দ:) নির্দেশনা বিরোধী হয়। বরং এটা তারই নিয়ে আসা মঙ্গল বটে। এই হলো আলেমদের ঐ কথার মর্মমূল যে,

ان ما شهد له شاهد من الشرع بالطلب خاصا أو عامًا ليس من البدعة وان لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله بخصوصه أو امر به امرا خاصا

–'শরীয়তের কোন দলীলে যদি প্রমাণিত হয় যে, বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে অথবা সাধারণভাবে শরীয়তের আবেদন তাহলে সেটি আর বেদআত হয় না। যদিও সুনির্দিষ্টভাবে সে কাজটি রাসূলুল্লাহ (দ:) করেন নি অথবা সুনির্দিষ্টভাবে কাজটি করার নির্দেশও তিনি দেন নি।' আর এটিই রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর তরীকা। অচিরেই আমরা বহু সহীহ ও হাসান হাদীসে তা দেখতে পাব। এমনই ছিল তাঁর হকপন্থী খলীফাগন এবং তাঁর সত্যের পথিক সাহাবা কেরাম। একটু পরেই আমরা তাঁদের অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করব, যা তাঁদের নবীরই সুন্নাত।

এই সকল দলীলাদির মধ্যে রয়েছে ইতিবাচক কিছু দলীল যাতে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর কাছে গ্রহণীয় হওয়ার কথা আছে। কারণ সেটি আসলে বিধানেরই শামিল। আর আছে যা তিনি (দ:) প্রত্যাখান করেছেন। এগুলো বিধি সম্মত নয়। অথবা এতে রয়েছে চরম কঠোরতা, বা বৈরাগ্য যা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাঁর উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের জন্য গ্রহণীয় বলে অনুমোদন করেন নি অথবা তা শরীয়তের কোন সুস্পষ্ট দলীলের বিরোধী। এ আলোকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সুন্নাত আসলে কী? আর বিদআতই বা কী?

এখন আপনার সম্মুখে আমরা এমন কিছু উদাহরণ তুলে ধরব যা তিনি তার সাহাবীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন। অথচ এটা তাঁর নিজের কোন কাজ ছিল না বরং প্রায়শ দেখা যায় সেটা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর অবস্থানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। তবু ও তা বৈধ।

الادلة التى توضح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يحدث

অভিনব কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (দ:) এর সুন্নাত কী, এ বিষয়ে কিছু প্রামাণিক দলীল ঃ

দেখুন ভাই, (আল্লাহ্ আপনাকে ও আমাকে সত্য ও সোজা পথে পরিচালিত করুন) বেশ কিছু এমন হাদীস রয়েছে যা সহীহ সঙ্কলনগুলোত সঙ্কলিত অথবা সহীহ হিসেবে প্রমাণিত যা প্রমাণ বহন করছে যে, কিছু সংখ্যক সাহাবী কিছু আমল, জেকের ও দোয়া ইত্যাকার জিনিষ নতুনভাবে করেছেন, যা ইতোপূর্বে রাসুলুল্লাহ্ (দ:) করেন নি অথবা করতে বলেন নি। অথচ তাঁরা এগুলো এ গবেষণা ও বিশ্বাস থেকে করেছেন যে, তা ভাল- যা মহান ইসলাম ও তার মহান রাসূল নিয়ে এসেছেন এবং এ আয়াতের ছত্রছায়ায় তাকে উৎসাহিত করেছেন–

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون –'উত্তম কাজ কর, এতে তোমাদের সাফল্য আসবে।' এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর বাণীও রয়েছে–

ومن سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها بعده من غير ان ينقص من أجورهم شئى

–'যে ব্যক্তি ইসলামে উত্তম কোন রীতি প্রবর্তন করবে সে তার প্রতিদান পাবে এবং সেও, যে তা আমল করবে অথচ তার সওয়াবে কোন কমতি হবে না। এটি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

এ হাদীসটি যদিও সাদ্কার ব্যাপারে এসেছে তবুও সর্বসম্মত সূত্র হলো ঃ

إن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب 'কোন বাণী বা শব্দের আবেদনের ব্যাপকতাই

গণ্য করা হবে, শব্দটি যে নির্দিষ্ট কারণ বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে সেটা কোন বিবেচ্য বিষয় নয়।'

(অর্থাৎ কোন এক উপলক্ষ্যে হাদীস কুরআনের অবতারণা হলেও ভাষ্যের ব্যাপকতা অনুযায়ী আমল করতে হবে, শুধু ঐ একটি উপলক্ষ্যের জন্যই উক্ত অর্ডারকে নির্দিষ্ট রাখা যাবে না)।

আর এর অর্থ এ নয় যে, যে কেউ শরীয়ত সৃষ্টি করতে পারবে। কারণ, ইসলামের মূল সূত্রগুলো সীমিত। কাজেই কেউ কোন রীতি প্রবর্তন করতে চাইলে ঐ নিয়ম-নীতি, সূত্র ও সাক্ষ্যের বিচারে সংরক্ষিত হতে হবে। এই প্রেক্ষাপট থেকেই বহু সাহাবা বহু কাজ তাদের নিজস্ব ইজতেহাদ থেকে করেছেন। কাজেই এ আলোকে রাসূলুল্লাহ্(দ:) এর 'সুন্নাত' বা তরীকা হলো এমন সব কাজ অনুমোদন করা যা ইবাদত, কল্যাণকর ও বৈধ বিষয়াদির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ– সাংঘর্ষিক নয় এবং ওই সব জিনিষ প্রত্যাখান করা যা তার সাথে বিরোধপূর্ণ। আর এটাই হচ্ছে তাঁর সুন্নাত বা আদর্শ। যার অনুসারী ছিলেন তাঁর খলীফা ও সহচরগণ। আর এ থেকেই আলেমরা তাঁদের এ অভিমত চয়ন করে নিয়েছেন যে–

إن ما يحدث يجب ان يعرض على قواعد الشريعة ونصوصها فما شهدت له الشريعة بالحسن فهو حسن مقبول وماشهدت له الشريعة بالمخالفة والقبح فهو المردود وهو البدعة المذمومة.

–'যা অভিনব ঘটবে তাকে অবশ্যই শরীয়তের বিধি ও সূত্রগুলোর নিগড়ে ফেলে বিচার করতে হবে। তারপর শরীয়ত ও তার প্রমাণাদি ভাল বলে রায় দিলে তা ভাল ও গ্রহণীয় হবে। আর যেটাকে বিরোধী ও খারাপ বলে সাক্ষ্য দিবে তা হবে প্রত্যাখ্যাত- আর সেটাই হচ্ছে মন্দ বেদ্আত।'

তাঁরা প্রথমটিকে কখনো 'বেদআতে হাসানাহ' নামকরণ করে থাকেন। এটা অবশ্য আভিধানিক অর্থের দিক থেকে বলে থাকেন। কারণ কাজটা তো অভিনব– নূতন। না হয় মূলত: এটা শরীয়তের পরিভাষায় বেদ্আতই নয় বরং এটা 'উৎকলিত সুন্নাত' (بدعة مستنبطه)। কারণ, শরীয়তের প্রমাণাদি এটাকে গ্রহণের রায় দেয়। আর এই আভিধানিক অর্থেই সাইয়্যেদুনা উমর (রা:) তারাবীহ্ নামাজ সম্পর্কে বলেছিলেন– نعمت البدعة هذه –'আহা, কী উত্তম বিদ্আতই না এটা।'

আর যারা বিদআতে হাসনাহ্কে অস্বীকার করে তারা মূলত: হাদীসের বাহ্যিক অর্থের পিছে পড়ে শুধু "বিদআত"(নূতন কাজ) শব্দটির বাইরের খোলস গ্রহণ করেই এটা করে থাকে। এমন কি কেউ কেউ খলীফা উমরের কথাটিকে প্রত্যাখান করার দু:সাহসও দেখিয়েছে। তারা তাঁর কথা نعمت البدعة (কী অপূর্ব ভাল কাজ) এর বিপরীতে বলেছে বেদ্আতের মধ্যে আবার হাসানাহ্ কিসের!

যাক্, তাদের কথা রেখে আমরা পূর্বোল্লেখিত ইঙ্গিত অনুযায়ী প্রমাণ স্বরূপ সাহাবা কেরামের কিছু কিছু আমল এবং তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর আচরণ তুলে ধরছি : রাসূলুল্লাহ্ (দ:) কর্তৃক গ্রহণের কিছু প্রমাণ-এ পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে ঃ

১. প্রথম হাদীস

এটি বর্ণনা করেছেন- বুখারী, মুসলিম, ইমাম আহ্মাদ– আবু হোরায়রা (রা:) থেকে। নবীজী বেলালকে সালাত এশার সময় বললেন: বেলাল! আমাকে তোমার সবচে' পূন্যের কাজটির কথা বল যা ইসলাম গ্রহণের পর তুমি করেছ। কারণ, আমি জান্নাতে তোমার জুতোর আওয়াজ শুনেছি।

আমার কাছে আমার কৃত উত্তম ইবাদত মনে হয় এটাই যে, আমি দিন রাতের যখনই একবার পবিত্রতা অর্জন করেছি, তা দিয়েই আমার ফরজ সালাতগুলো আদায় করেছি। তিরমিযীর হাদীসে তিনি যোগ করেছেন: 'হাসান সহীহ'। তিনি বেলালকে বললেন, তুমি কিসের বলে আমার আগে আগে জান্নাতে গেলে? উত্তর করলেন- আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু'রাকাত পড়েছি। আর যখনই আমার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে পবিত্রতা অর্জন করছি এবং মনে করেছি আল্লাহ্র জন্য আবার দুরাকাত পড়া দরকার। তখন নবীজী বললেন, হ্যাঁ, ওটা দ্বারাই তুমি এ সম্মান লাভ করেছ।'

হাকেম এটি বর্ণনা করে বলেছেন: উভয়ের শর্তমতে এটি সহীহ, আর যাহাবী এটাকে স্বীকার করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন: এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ইবাদতের জন্য নিজে চিন্তা করে সময় নির্ধারন করা জায়েয। কারণ বেলাল তো চিন্তা গবেষণা করেই উল্লেখিত কাজটি করেছেন এবং তা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) অনুমোদন করেছেন।[১]

এ হাদীসের অনুরূপ আরেকটি হাদীস আছে– হাদীসে খাব্বাব। বুখারীতে। সেখানে আছে– তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যে বন্দীদশায় মৃত্যুর আগে দু'রাকাত সালাত আদায় করার সুন্নাত বা রীতি প্রচলন করেন।[২]

এ হাদীসগুলো স্পষ্টত: প্রমাণ করছে যে বেলাল ও খাব্বাব (রা:) উভয়ই ইবাদতের সময় নির্ধারনে এজতেহাদ করেছেন্। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ, আমল কিছুই প্রকাশ পায় নি। কেবল একটা সাধারণ আবেদন (طلب عام) ছিল। 'সালাত উত্তম বিষয়, তা থেকে চাইলে কিছু কমাও অথবা বাড়াও..।' আল্-হাদীস।

(১) দেখুন ফাতহুল বারী পৃ: ২৭৬, খন্ড ৩।
(২) প্রাগুক্ত- পৃ: ৩১৩ খন্ড ৮।

কাজেই যদি কেউ নির্দিষ্ট ওয়াক্তে সালাত করতে চায় তাহলে তা ঐ ব্যক্তির নিকট বিদ্আত হয়ে যাবে, যে ঐ নিষেধটিকে ব্যাপক বলে মেনে নিয়েছে। আর ঐ ব্যক্তির কাছে এটা বিদ্আত নয় যে, ঐ নিষেধটিকে কেবলমাত্র নফলের ক্ষেত্রে সীমিত বলে বুঝেছে। হ্যাঁ, শাফেয়ী মাযহাবের লোকেরা এই নিষেধকে ওয়াক্তিয়া নামাজ ও কারণ বশত: নামাযের বাইরের নামাযের মধ্যে সীমিত রাখে। তাঁরা অযুর সুন্নাতের বেলায় মতানৈক্য করেছে। ইমাম গাযালী তখনো তা করতে মানা করেছেন এবং বলেছেন-অযু তো সালাতের জন্য করা হয়ে থাকে, এখন সেতো সালাত আদায় করছে না। কারণ সে তো কেবল অযুই করল। কাজেই এটাকে কোন কারণবশত: নামায বলা যাবে না। যাক, প্রত্যেকের রয়েছে নিজস্ব চিন্তাধারা এবং বোঝার কৌশল। আল্লাহ্ তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

২. দ্বিতীয় হাদীস

বর্ণনা করেছেন–বুখারী ও মুসলিম প্রমূখ। অধ্যায়: সালাত, পরিচ্ছেদ: রাব্বানা লাকাল হাম্দ।' রেফাআহ বিন রাফে' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন -আমরা রাসূলুল্লাহ্(দ:) এর পিছনে নামায পড়তাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠাবার সময় বলতেন- 'সামে আল্লাহু লেমান হামিদাহ্'। তখন তাঁর পিছনে দাঁড়ানো একজন লোক বলল : "রাব্বান ওয়া লাকাল হামদ্, হামদান কাসীরান তাইয়্যেবান মোবারাকান ফীহ্।"

নামায থেকে অবসর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন- কে কথা বলছিল? লোকটি উত্তর দিল: আমি। তিনি বললেন: আমি ত্রিশজনেরও বেশী ফেরেশ্তাকে দেখলাম প্রতিযোগিতা করছে কে তা লিখবে।'

হাফেয আসকালানী তার ফতহুল বারীতে এ প্রসঙ্গে বলেন: এতে প্রমাণিত হয় যে, সালাতে নবীজীর শেখানো যিকর ছাড়াও কিছু যিক্র নতুনভাবে অবতারণা করা জায়েয-যদি তা শেখানো দুআ বা যিক্র এর বিরোধী না হয়। এছাড়াও প্রমাণিত হলো যে, সালাতে যিক্র উচ্চ কণ্ঠে পড়া যায়– যদি তা অন্যের বিঘ্ন না ঘটায়।

অনুরূপ বর্ণনা করেছেন: সান্আঈ ও আব্দুর রাজ্জাক তার 'মুসান্নাফ'এ– ইবনে উমর (রা:) থেকে :

"তিনি বলেন -লোকেরা সালাতে, এ সময় একজন লোক কাতারে পৌঁছেই বললেন: আল্লাহু আকবার কাবীরান ওয়াল হামদু লিল্লাহে কাসীরান, ওয়া সুবহানাল্লাহে বুক্রাতান ওয়া আসীলা'। নামায শেষে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) জিজ্ঞেস করলেন- ঐ শব্দগুলো কে উচ্চারণ করেছিল? লোকটি বলল: আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ্র কসম, আমি ভাল ছাড়া অন্য কোন কিছুর উদ্দেশ্যে তা করি নি। তিনি বললেন- আমি দেখলাম

আসমানের দরজাসমূহ ওগুলোর জন্য খুলে গেছে। ইবনে উমর (রা:) বলেন- এ কথা শুনার পর আমি সেগুলো আর কখনো ছাড়ি নি।

এটিকে আরো বর্ণনা করেছেন নাসাঈ। "অনুচ্ছেদ: যে কথা বলে সালাত শুরু করা হয়"। তিনি সেখানে শুধু এই স্থানটুকু অন্যভাবে বলেন: বার জন ফেরেশ্‌তা এর দিকে ছুটে আসে। তাঁর আরেক বর্ণনায় আছে: 'এ দেখে আমি অবাক হলাম।" এরপর আরো কিছু বললেন। যার অর্থ: তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে গেল। ঐ হাদীসে এও আছে– ইবনে উমর বলেন: রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকে এ কথা শোনার পর আমি আর তা কখনো ছাড়ি নি। আর হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে সঙ্কলিত।[১]

এবার তাহলে দেখুন, সত্যটা কি। আল্লাহ্ আপনাকে ও আমাকে তৌফিক দিন। দেখুন, কীভাবে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এমন কিছু বাড়তি যিক্‌র ও দুআকে বহাল রাখলেন যা আগে তিনি (দ:) কখনো রুকূ থেকে উঠে বলেন নি। দেখুন, বাড়তি যিক্‌র যা সালাত শুরুর সময় বলা হয়েছে, যা ইতোপূর্বে শারে' থেকে প্রকাশিত হয় নি। অথচ উভয় ব্যক্তিকেই তিনি (দ:) উচ্চ স্বীকৃতি ও সন্তোষ জ্ঞাপন করলেন। কারণ, দুটি স্থান ও বিষয়ই সালাতে আল্লাহ্‌র প্রশংসার স্থান।

এটাও দেখুন আর সঙ্গে কিছু কুপমুন্ডকের কথাও দেখুন- 'সালাতুল ফজরে কুনূত পড়া বিদআত। অথচ এটার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকেই প্রমাণিত। যদিও হাদীস আনাস বা কিছু সাহাবীর কাজ নিয়ে তারা কিছু 'কি ও কেন' করেই থাকুক।

আব্দুর রায্‌যাক, ইবনে জুরাইহ্ ও 'আতা সূত্রে বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমি তাকে বললাম কুনূত তো জুমার দুই রাকাতে। তিনি বললেন- ফজর ছাড়া কোন ফরয নামাজে কুনূত আছে বলে তো শুনি নি।' অবশ্য কুনূত আছে বা তার বৈধতা নিয়ে এখানে আলোচনার আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। বরং এটাই দেখাতে চেয়েছি যে, বিদআত সম্পর্কে কঠোর বাড়াবাড়ি এ পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, সালাতের দুআর স্থানে দুআ নিয়েও বাড়াবাড়ি করতে ছাড়ে নি তারা। কারণ, যে সব হাদীস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এতে সুস্পষ্ট যে, সালাতে দুআর স্থানে যে দুআ করা হয় তা সুন্নাত, ওটা আদৌ বিদআত নয়।

কারণ, রাসুলুল্লাহ্ (দ:) সাহাবাদের তা করতে দেখে তা অনুমোদন করেছেন। কাজেই এটাও মাসূর (বা সুন্নাহ্) হিসেবেই পরিগণিত। আর এ ধরনের বিষয় সুন্নাহর

(১) হাদীসটি সহীহ মুসলিম, নাসাঈ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে আনাস থেকে। আবু দাউদে এ হাদীস রাফে' আদ দারকী' থেকেও বর্ণিত। আবু দাউদে আব্দুল্লাহ্ বিন আমের এবং তাঁর বাবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– এক আনসার যুবক রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর পিছনে নামাজে দাঁড়িয়ে হাঁচি দিলে সে বলে– الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى رضى ربنا من امر الدنيا والاخرة নামায শেষে রাসূলুল্লাহ (দ:) জিজ্ঞেস করলেন ঃ কে ? এ দোয়া কে পড়েছে ? .....সেখানে আছে– রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তখন বলেন: সেগুলো রাহ্‌মান তায়ালার আরশের সামনে গিয়ে পৌঁছাল।

অন্তর্ভুক্ত, যদিও ঐ শব্দ বিন্যাসে তা আসে নি। তাহলে যার শব্দও নবীজী থেকে বর্ণিত এবং তার স্থানও সালাত বলে বর্ণিত আছে তার কি হবে। কাজেই কুনূতের বেলায় যা বলা হবে, প্রমাণিত হওয়া সত্বেও বিসমিল্লাহকে শব্দ করে পড়ার বেলায়ও তা বলা হবে। কারণ এ বিষয়ে অদ্যাবধি দ্বন্দ লেগে আছে ঐ সব কুপন্ডকদের জন্যই।[১]

অথচ তাদের কেউ কেউ ফাতেহা তো পড়ে, বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে না, কমপক্ষে সশব্দে পড়ে না। আবার যখন অন্য একটি সূরা পড়ে তখন বিস্‌মিল্লাহ্ শব্দ করে পড়ে। কী আশ্চর্য! ফাতেহা কি কুরআনের অন্যতম সূরা নয়? তার প্রথমেই তো বিসমিল্লাহ্ আছে। তারা নিজেরাও যদি তা একটু আমল করতো!

মূল কথা, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) সাহাবীদ্বয়কে নামাজের দোয়ায় তাদের বাড়ানো অংশটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ তা তাঁর পক্ষ থেকে ব্যক্ত ছিল না। আর এটিই হচ্ছে প্রমাণের বিষয়, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর ঐ কাজগুলো ছিল তাদের দু জনের ব্যক্তিগত ইজতেহাদ বা গবেষণা।

৩. তৃতীয় হাদীস

এটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী । অধ্যায় : সালাত। অনুচ্ছেদ : 'এক রাকাতে দুই সূরা একত্রিত করা।'

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন আনসারী মসজিদে কোবায় আমাদের নামাজের ইমামতি করতেন। সে সালাতে এই কুলহুয়াল্লাহু সূরা দিয়ে শুরু করতেন এবং এর সাথে একই রাকাতে অপর একটি সূরা পড়তেন। তখন তার সাথীরা তাকে বলল, আপনি একটি সূরা তেলাওয়াতের পর মনে করেন যে এতে নামায জায়েজ হবে না। তাই বুঝি পরক্ষণেই আরেকটি সূরা পড়েন ? আপনার উচিত, হয় সেটিই পড়বেন, না হয় সেটা বাদ দিয়ে অন্য একটা পড়বেন। তখন তিনি বললেন- আমি সেটা ত্যাগ করতে পারব না, আপনারা চাইলে ইমামতি করব, না হয় করব না। তারা দেখল তিনি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং অপর কেউ নামাজ পড়ালেও পছন্দ হলো না। তখন তারা নবীজীর কাছে এসে বিষয়টা খুলে বলল। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, ওমুক! তুমি কেন তোমার সাথীদের কথা মত কাজ করছ না, কেনই বা এই সূরাটিকেই সব রাকাতে অবধারিত করে রেখেছ? সে উত্তর করল, আমি এটাকে ভালবাসি। তখন নবীজী বললেন, এটির প্রতি ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো।'

(১) কুনূতের হাদীসগুলো সম্পর্কে তারা বলেন: এগুলো 'মুদ্‌তারেবাহ'–অসংলগ্ন। ইবনুল কাইয়্যেম বলেন- সব কয়টিই প্রমাণিত। ইমাম শাফেয়ী হাদীসে আনাসকে গ্রহণ করেছেন। হাদীসে আনাস– 'ফজরের কুনূত তিনি (দ:) দুনিয়া ছাড়ার আগ পর্যন্ত পড়েছিলেন। কুনূতের বিষয়ে হাদীসে আনাসের মত বিসমিল্লাহ্‌র বিষয়েও একই রকম এদ্‌তেরাব (ভাষ্যের বিভিন্নতা) রয়েছে। বরং তার চেয়েও বেশী। কারণ, সেটা একই সূত্রে হয়েছে ইবনে আবদুল বার্র তা-ই উল্লেখ করেছেন। বিসমিল্লাহতে উচ্চ কণ্ঠ করা অন্যান্য সূরাতে জোরে পড়ার মতই। গ্রহণ তো বর্জনের উপর অগ্রাধিকার পায়। 'হ্যাঁ' তো 'না' এর উপর। এটা তো উসূলের কিতাবে স্বীকৃত সত্য। দেখুন– تنوير الحوالك 'তাম্‌হীদ' থেকে সঙ্কলিত , পৃ: ৭৮,৭৯।

আপনার প্রতি মহান আল্লাহ্‌র সালাত, হে রাসূলুল্লাহ্ (দ:)! আপনার দিক নির্দেশনার থেকে ওইসব বেদআত ফতোয়াবাজরা কত দূরে!

হাফেয তার ফাত্‌হে বলেন: তিনি (দ:) যে বললেন- তুমি কেন তোমর সাথীদের কথা মত কাজ করছ না, আর এ রূপ করার উদ্দেশ্য কি? এখানে প্রশ্ন ছিলো দুটি, সে উত্তর দিলঃ আমি এটাকে ভালবাসি। এটা তো দ্বিতীয় উত্তর, যাতে প্রথমটিরও উত্তর হয়ে যায়। এখানে অপর একটি বিষয় সংযোজিত হয়েছে। তা হচ্ছে- সালাতে নির্দিষ্ট সুন্নাত কায়েম করা। অন্তরায়টি ভালবাসায় মিশ্রিত। আর নির্দিষ্ট বিষয়টি এবং তা করার উদ্বুদ্ধকারী হচ্ছে একমাত্র মুহাব্বত। এটাও ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তার কাজটি নবীজীর কাজের উপর বাড়তি। এখানে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়াটা তার কাজে তাঁর (দ:) সন্তোষেরই প্রমাণ।

এ হাদীসের প্রসঙ্গে নাসেরুদ্দীন ইবনুল মুনীর বলেন- উদ্দেশ্য অনেক সময় কাজের হুকুম বদলে দেয়। কারণ, ধরুন ঐ লোকটি যদি বলতো যে ঐ সূরাটির পুনরাবৃত্তি করার কারণ– সে এ ছাড়া আর কোন সূরা মুখস্ত জানে না, তাহলে সম্ভাবনা ছিল যে তাকে তিনি (দ:) অন্য সূরা শেখার আদেশ দিতেন। কিন্তু না, সে এর কারণ হিসেবে ওটার প্রতি তার মুহব্বতকে ব্যক্ত করেছে। তখন তার উদ্দেশ্যের বিশুদ্ধতা প্রকাশ পেল এবং তিনিও তা সঠিক বলে রায় দিলেন।

তিনি বলেন- এতেই প্রমাণিত হয় যে মনে টানার কারণে কোন নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতাংশকে নির্ধারিত করে সেটা বেশী বেশী পড়া জায়েয এবং এতে অন্য সূরা পরিত্যাগ করা বুঝায় না। এই যে রাসূলুল্লাহ (দ:) তার কাজ বহাল রাখলেন এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন- এ সম্পর্কে আমরা এর আগে কোন আলেম বা সাহাবী পাই নি যে, তাঁর এ কাজ আগে থেকেই সুন্নাত বলে প্রমাণিত ছিল। কারণ, যে কাজটি রাসূলুল্লাহ্ (দ:) সব সময় করতেন, কেবল সেটাই আমাদের সব সময় করা প্রয়োজন। কিন্তু এটা আমাদের এই প্রমাণ দেয় যে, এ ধরনের কাজ যদিও রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর কোন আম কাজের সাধারণ বিরোধী হয় সে ক্ষেত্রে বিষয়টির পরিসর সুবিস্তৃর্ণ। ওসব তথাকথিত ফেকাহ্‌বিদ্‌দের ধারণা মত নয়। কারণ, বিষয়টি বৈধতার বৃত্তে ও মূল উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিশীল।

৪. চতুর্থ হাদীস

ইমাম বোখারী কিতাবুত তাওহীদ-এ আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এক ব্যক্তিকে এক প্লাটুন সৈন্যের কমান্ডার করে পাঠালেন। সে তার সালাতে তার সাথীদের ইমামতি করার সময় কেরাত পড়তেন এবং সব সময় 'কুলহুয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে শেষ করতেন। যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল, এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) কে জানালো। তিনি বললেন- তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন সে এ রকম করে থাকে। তখন

সে উত্তর দিলঃ 'কারণ, এ সূরাতে রয়েছে আল্লাহ্ রাহমানুর রহীম-এর গুণাবলীর উল্লেখ। আর তাই আমি তা পড়তে ভালবাসি।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বললেন- তাকে গিয়ে বল, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসে।' অনুরূপ হাদীস মুসলিম শরীফেও আছে। কাজেই হাদীসটি মুত্তাফাক আলাইহ্ (উভয় গ্রন্থে উল্লেখিত)।

হাফেয তার ফাত্‌হে বলেন– 'ইব্‌ন দাক্বীকুল ঈদ বলেন– এটা প্রমাণ করে যে, তিনি সব রাকাতে এ সূরাটিই পড়তেন। এটাই স্পষ্টত: বুঝা যায়। আবার এও হতে পারে যে, তিনি তার শেষ কেরআত শেষ করতেন ঐ সূরা দিয়ে। কাজেই, এটা কেবল সর্বশেষ রাকাআতেই করতেন। 'অর্থাৎ উভয় বিষয়ই রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর কাজ হিসেবে ইতোপূর্বে নির্দিষ্ট ছিল না। তারপরও তিনি তাকে উচ্চ পর্যায়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে- আল্লাহ্ তায়ালা তাকে ভালবাসেন বলে সুসংবাদ"।১

এতদসত্ত্বেও আমাদের জানা নেই যে, কোন আলেম বলেছেন যে– শুরুতে এমনটি করা মুস্তাহাব (যেমন প্রাগুক্ত হাদীস) অথবা শেষে এরূপ করা মুস্তাহাব (যেমন এখানে)। কারণ, যে বিষয় রাসূলুল্লাহ (দ:) নিয়মিতভাবে করেছেন সেটাই মুস্তাহাব। কিন্তু এ ধরনের অনুমোদন কেবল এটাই সুস্পষ্ট করে তুলছে যে এ ধরনের ইবাদত-বন্দেগীতে তার গ্রহণের আদর্শ কি। এ ধরনের নতুন কিছুকে খারাপ গণ্য করা যায় না– কিছু কঠোর প্রকৃতির লোকেরা গণ্য করে থাকে। তারা বেদ্‌আত আর গোমরাহী বলার জন্য যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

এই তো গেল এক দিক। তা ছাড়া উল্লেখিত হাদীস দুটির প্রাসঙ্গিকতা এও নির্দেশ করে যে, এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। প্রথমে আনাসের হাদীসে রয়েছে যে, এ সূরাটি নির্দিষ্ট করে পড়ার কাজটি যিনি করেছেন তিনি মসজিদে কোবায় তার কওমের ইমাম, আর আয়েশা (রা:) এর হাদীসে রয়েছে যে, তিনি প্লাটুন কমান্ডার। আর ইনি যখন 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে শেষ করতেন তখন উনি তা দিয়ে শুরু করতেন। এনাকে আল্লাহ্‌র রাসূল সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তাকে ভালবাসেন আর উনাকে সুসংবাদ দিয়েছেন জান্নাতের। এতদুভয়ের মধ্যে এক ঘটনার প্রলেপ দেওয়ার সম্ভাবনাই নেই। দুটি ভিন্ন ঘটনা। আর দেখতেই পাচ্ছেন, যে হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সব সালাতের প্রসঙ্গে। আর এটা হচ্ছে শারীরিক ইবাদতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর এ বাণীও আছে– صلّوا كما رأيتموني اصلّى

–'সালাত আদায় করো, যেমনটি আমাকে করতে দেখেছ।'

এতদসত্ত্বেও তিনি তার এই সব গবেষণালব্ধ আমল গ্রহণ করেছেন। কারণ, তার কাজটি শারে' (নবীজী)-এর নির্ধারিত কাঠামোর বাইরে নয়। প্রত্যেকের এটা মেনে চলতে হবে। এর বাইরে যা আছে সে ব্যাপারে বিষয়টি সুপরিসর– যতক্ষণ পর্যন্ত তা

(১) দেখুন, ফাতহুল বারী- পৃ: ১২৫, খন্ড ১৭।

মূল উদ্দেশ্যের ভিতর থাকে। আর এটাই হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত ও তাঁর তরীকা। আর এটা একেবারেই সুস্পষ্ট এবং আলেমগণ যার সূত্র এভাবে ব্যক্ত করেন: যে সব আমল শরীয়তের আবেদন বলে সপ্রমাণিত ও কোন সুস্পষ্ট দলীলের সাথে সংঘাতপূর্ণ নয় এবং এতে কোন ক্ষতি বয়ে আনবে না, সেটা বিদ্আতের সীমা মাড়াবে না বরং সেটা সুন্নাতেরই অন্তর্ভূক্ত। যদিও এর চেয়ে অন্যটা অধিকতর ভালও থাকতে পারে। কারণ, ইবাদতের কিছু আছে ভাল আবার কিছু আছে উৎকৃষ্ট। এজন্যই এরমধ্যে কেউ যদি কিছুটা সহজিকরণ করে তাকে বেদ্আতী খারাপ বলা যায় না। কারণ, মূল কাজটা তো ইবাদত।

এখন আমরা এমন কিছু এজতেহাদ বা গবেষণার বিষয়ে আসছি যা রাসূলুল্লাহ (দ:) স্বীকার করে নিয়েছেন। এগুলো সালাতের বাইরের জিনিষ। যাতে দেখতে পাব যে, কিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) সেগুলো স্বীকার করে নিয়েছেন: যেমন ঃ

৫. পঞ্চম হাদীস

রুক্ইয়াহ্র হাদীস : (ঝাড়ফুঁক বিষয়ক)

হাদীসটি বুখারী তার সহীহ-এর একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। যেমন– অনুচ্ছেদ: ঝাড়ফুঁক (باب النفث فى الرقية)।

আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবীজীর একদল সাহাবী একবার এক সফরে বের হলেন। তারা এক আরব গোত্রের এলাকায় উপনীত হয়ে তাদের কাছে মেহমান হতে চাইল। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখান করে। ঘটনাক্রমে তখন সে গোত্রপতিকে সাপে দংশন করেছিল। তখন তারা সব রকম তদবির করলেও কিছুতে কিছু হলো না। তখন তাদের কেউ কেউ বললো- তোমরা যদি তোমাদের কাছে আসা ঐ দলটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করতে, হয়তো তাদের কারো কিছু জানা আছে। তখন তারা এসে বললো : হে মুসাফির দল! আমাদের গোত্রপতিকে সাপে দংশন করেছে, আমরা সব চেষ্টাই করেছি। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। বল তো তোমাদের কারো কাছে এর কোন প্রতিষেধক আছে কি? তখন তাদের একজন উঠে বলল: হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই ঝাড়ফুঁক জানি। কিন্তু তোমরা মেহমানদারী করলে না। কাজেই আমাদের জন্য কিছু না করলে, আমিও ঝাড়ফুঁক করব না। তারপর একপাল মেষের বিনিময়ে সন্ধি হলো। তারপর সে গিয়ে 'আল্- হামদুলিল্লাহ্' সূরা পড়ে পড়ে ঝাড়ফুঁক করতে লাগল। মনে হলো যেন সে দড়ি পাকাতে লাগলো। এতে আস্তে আস্তে তার বিষ নেমে যেতে লাগল। তখন তারা তাদের সন্ধিকৃত বস্তু দিয়ে দিল। তখন কেউ কেউ বললো- ভাগ কর। তখন যে ঝাড়ফুঁক করেছিল সে বলল এখন কিছু করো না, আগে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর নিকট গিয়ে যা হয়েছে সব বলি, তাঁর অপেক্ষা করি, তিনি কি হুকুম দেন। তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর নিকট এসে তাঁর কাছে সব খুলে বললেন। তখন তিনি

বললেন: তুমি কিভাবে জানলে যে এটা ঝাড়ফুঁকের কাজ ও করে! ঠিকই করেছো, ভাগ কর এবং তোমাদের সাথে আমার ভাগটাও রাখবে।'

হাফেয আসকালানী তার ফতহুল বারী গ্রন্থে (কিতাবুল এজারাহ–ভাড়া অধ্যায়) বলেন- তিনি যে বললেন: 'আরে! তুমি কিভাবে জানলে?' এ কথা কেবল তাজ্জবের সময় বলা হয়ে থাকে। কখনো আবার কোন বিষয়কে বড় করে দেখাবার সময়ও বলা হয়ে থাকে। এখানে সেটাই প্রযোজ্য।

শো'বা তাঁর বর্ণনায় এটুকু বেশী বলেন- 'তিনি (দ:) কোন নিষেধ বাক্য উচ্চারণ করেন নি।' সুলাইমান বিন কুন্নাদ তার বর্ণনায় 'তুমি কিভাবে জানলে এটা রুক্ইয়া' এরপর এটুকু বেশী বলেন- 'তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মনে কে যেন কথাটি ঢেলে দিল।'

এখানে এটা স্পষ্ট যে, সূরা ফাতেহা দিয়ে যে ঝাড়ফুঁক করা যায় এ সম্পর্কে এ সাহাবীর কোন পূর্ব জ্ঞান ছিল না। বরং কাজটি তিনি ইজতেহাদ বা চিন্তা করে করেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) দেখলেন এতে শরীয়তের বিরোধী কোন কাজ নেই, তখন তিনি অনুমোদন করলেন। কারণ, এটাই তাঁর সুন্নাত ও আদর্শ। যে কোন ভাল ও কল্যাণকর বিষয়, যা পরিণামে কোন ক্ষতি ডেকে আনে না, সেটা যদি সুনির্দিষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর আমল নাও হয়ে থাকে তা গ্রহণ করা তার আদর্শ। আর রাসূলুল্লাহ্ (দ:) যে বলেছেন তোমরা ঠিকই করেছো, ভাগ বাটোয়ারা করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও এক ভাগ দিবে, এ কথা দ্বারা যেন তিনি তাদেরকে ভালভাবে অভয় দিতে চেয়েছেন। (হাফেয তা-ই বলেছেন)

৬. ষষ্ঠ হাদীস

সাহাবীদের সাথে এ ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল। এক ব্যক্তি ছিল মানসিক ভারসাম্যহীন। সাহাবীদের একজন সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দেওয়ার পর সে ভাল হয়ে যায়। এটি বর্ণনা করেন– আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ–খারেজা বিন সাল্ত তার চাচা থেকে। তিনি বলেন- তিনি একটি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওখানকার লোকেরা তাদের একজন পাগল লোককে লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। তখন তারা বলল- তুমি তো ঐ লোকটির কাছ থেকে কল্যাণকর জিনিষ নিয়ে এসছো, তাহলে আমাদের এ লোকটিকে ঝাড়ফুঁক দাও তো! তখন তিনি সূরা ফাতেহা দিয়ে তাকে ঝাঁড়ফূক দিয়েছিলেন। হাফেয এটা তার ফাত্হে উল্লেখ করেছেন।

৭. সপ্তম হাদীস

ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি একজন বধির লোকের কানে কিছু একটা পড়েছিলেন। এতে সে কানে শোনা শুরু করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কি পড়লে? তিনি বললেন: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا এখান থেকে এ সূরার

শেষ পর্যন্ত। তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বললেন- যদি কোন মো'মেন এটা কোন পাহাড়ের উপরও পড়ে তাহলে তা সরে যাবে। হাফেয হাইসামী- মাজমাউয-যাওয়ায়েদে বলেন এটি আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন। এর সনদে ইবনে লুহাইআহ্ আছে। এর হাদীস হচ্ছে 'হাসান'পর্যায়ের। এ ধরনের আরেকটি হাদীস হাফেয ইবনে হাজর- এর 'আল্-মাতালেব আল- আলিয়াতে' রয়েছে।[১]

ঐ হাদীসে ইবনে মাসউদের একটি কাজকে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) অনুমোদন করেছেন। কাজটি হলো, তিনি কোন এক রোগীর উপর সূরা মো'মেন এর শেষ আয়াতগুলো পড়েছিলেন। অথচ এটা ইতোপূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকে শোনেন নি। বরং এটা নিছক তার ব্যক্তিগত গবেষণা ছিল। যখন এর মধ্যে শরীয়ত বিরোধী কিছু ছিল না তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তা অনুমোদন করেন। যেমন বোখারীতে উল্লেখিত সেই ফাতেহা দিয়ে ঝাড়ফুঁকের কাজটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ হাদীস অন্যান্য সুনানেও আছে। ঐ দুটো আলাদা ঘটনা ছিল। একটি আবু সাঈদ এর, অপরটি তার চাচা খারেজা বিন আস্ সাল্ত এর। আর এটি তৃতীয় ঘটনা- ইবনে মাসউদের। চতুর্থ আরো একটি ঘটনা আছে যা ইবনে হেব্বান বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি আলাকা বিন হেজার এর। এটা অষ্টম হাদীস।

৮. অষ্টম হাদীস

ইবনে হেব্বান তার সহীহ্ সঙ্কলনে এনেছেন, আলাকাহ বিন হেজার আস্-সুলাইতি আত্- তামীমী বলেন যে, তিনি নবীজীর দরবারে এসে তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার সময় এক গোত্রের এলাকা অতিক্রম করছিলেন। তখন দেখলেন তাদের এক লোককে তারা লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে। তখন ঐ এলাকার লোকেরা বলল-আমরা শুনেছি তোমাদের সাথী ঐ লোকটি নাকি কল্যাণ নিয়ে এসেছেন। কাজেই তোমার নিকট কি এমন কিছু আছে যা দিয়ে এর অসুবিধা সারানো যায়। তিনি বলেন- এ কথার জবাবে আমি সূরা ফাতেহা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করি, এতে সে ভাল হয়ে গেল। তারা আমাকে একশটি ছাগল দিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর নিকট এসে ঘটনাটি বললাম- তিনি বললেন, এটা গ্রহণ কর।' আরে! যারা বাতেল ঝাড়ফুঁক করে খায়, তারা তো মিথ্যার বেসাতি করছে। আর তুমি তো খেয়েছ হক ঝাড়ফুঁক করে।'

(من موارد الظمأن من زوائد ابن حبان للهيثمى) [২]

৯. নবম হাদীস

বুখারীতে 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' এর মাহাত্ম প্রসঙ্গে আবু সাঈদ আল্-খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বারবার 'কুল হুয়াল্লাহু' পড়তে শুনে সকাল বেলা নবীজীর নিকট গিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ করলো। মনে হলো যেন সে

(১) দেখুন : পৃ: ৩৪৯, খন্ড ২ (মাতালেব)।
(২) দেখুন- পৃ: ২৭৬।

এটাকে সামান্য মনে করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বললেন: 'শপথ সে সত্ত্বার, যার হাতে আমার প্রাণ, এটা তো কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'।

হাফেয তার ফাত্হুল বারীতে বলেন- ঐ লোকটি ছিল কাতাদাহ বিন নো'মান। সঙ্কলন করেন- আহ্মাদ বিন তারীফ, ইবনুল হাইসাম, আবু সাঈদ থেকে। একবার কাতাদাহ্ বিন নো'মান শুধু (কুল হুয়াল্লাহু আহাদ) পড়ল। এর বেশী কিছুই পড়ল না। আর যে শুনলেন সে সম্ভবত: তার পেটভাই আবু সাঈদ। তারা উভয় পড়শী ছিল। একথা ইবনে আব্দুল বার্র জোর দিয়ে বলেন। দার কুত্নী 'মালিক থেকে ইসহাক বিন তাব্বা' সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন যে, আমার এক প্রতিবেশী আছে, রাত জেগে সালাত করে। তখন সে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ ছাড়া পড়ে না।[১]

ওই হাদীসে রয়েছে যে তার এভাবে এই সূরাটিকে নির্দিষ্ট করে শুধু সেটাই বার বার রাতের সালাতে পড়াকে রাসূলুল্লাহ (দ:) স্বীকৃতি দিয়েছেন। অথচ এভাবে নির্দিষ্ট করে পড়ার কোন আমল রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকে ইতোপূর্বে ঘটে নি। এ হাদীসেও ৩ ও ৪ নং হাদীসের মত এ প্রমাণ রয়েছে যে, কুরআনের কোন বিশেষ অংশের প্রতি দিলের টান থাকলে তা বেশী করে পড়া জায়েয। এতে অন্যটিকে পরিত্যাগ করা বুঝায় না। অথচ এতদসত্ত্বেও আমরা কোন আলেমকে বলতে শুনিনি যে, রাতের সালাতে শুধু ওই সূরাটি পড়া উত্তম। কারণ, পুরো কুরআন পড়ার যে আমল রাসূলুল্লাহ্ (দ:) করতেন সেটাই এর চেয়ে ঢের বেশী উত্তম। হ্যাঁ, ওই লোকটির আমল বা অনুরূপ আমল সুন্নাতেরই গন্ডিতে পড়ে। এত দোষণীয় কিছু নেই বরং সেটা নন্দনীয়ই বটে। এ হাদীসগুলো ও এর পরেরগুলো প্রমাণ করে যে, এ বিষয়টি বিদআত বলে ফতোয়া দেনেওয়ালাদের কাজটি ঠিক নয়।

১০. দশম হাদীস

সুনান গ্রন্থকার ও আহমাদ ইবনে হেব্বান তার সহীহ্ সঙ্কলনে আবু কুরাইদাহ ও তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করলাম। দেখি যে কি, এক ব্যক্তি নামাজে দোয়া করছে ঃ

اللهم إنى اسألك بأنى أشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

তখন নবীজী বলেন- 'শপথ সে সত্ত্বার যার হাতে আমার জান, সে তো আল্লাহ্র সবচে বড় নাম- ইসমে আজম- ধরে প্রার্থনা করল, যা দ্বারা কিছু চাইলে তা দেওয়া হয়, দোয়া করলে কবুল হয়।'

আর এ দোয়া তো সাহাবী নিজে থেকে বানিয়ে বলেছে। যা সুস্পষ্ট। যখন এটা মূল উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখতে পেলেন তখন নবীজী তা স্বীকার করে নিলেন-

(১) দেখুন ফাত্হুল বারী পৃ: ৪৩৫ খন্ড ১০

উচ্ছ্বসিতভাবে, খুবই সন্তোষের সাথে। এটাও জানা যায় নি যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাঁকে তা শিখিয়েছিলেন। কারণ, শরীয়তের ভাষাগুলোতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট ব্যাপকতা (العام المخصوص) এবং সেই ব্যাপকতা যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছুই বুঝানো হয়ে থাকে। এখানে থাকে হাকীকত ও মাজায– শাব্দিক অর্থেই উদ্দিষ্ট বস্ত বা বিষয় আবার রূপক অর্থে কোন বিষয়। এসব পারস্পারিক বৈপরীত্য দেখা দিলে কি করতে হবে, এসব অনেক সূত্র ও নিয়মও রয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে (ما من عام الا وقد خصص) এমন কোন ব্যাপকতা নাই যাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি।' সব সাধারণ বিষয়ই কোন না কোনভাবে নির্দিষ্ট হয়েছে। আর كل (সব) শব্দটি থাকলেই যে সুনির্দিষ্ট বা সীমিত হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। অচিরেই এ বিষয়টি আমরা পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে প্রত্যক্ষ করব।

এই সব নিয়মকানুন ও সূত্র যদি বেদআত ফতোয়াবাজদের জানা থাকতো তাহলে তারা এভাবে যে কোন কল্যাণকর বিষয়ই বেদআত বলে জবান দরাজ করতে পারত না। আর এভাবে প্রখ্যাত সব আলেমদের বিরুদ্ধে অপবাদ দিতে কলমের লাগাম ছেড়ে দিতে পারত না। যা তার থেকে নিম্নমানের আলেমরাই গ্রহণ করে না, তাদের কথা তো বাদই দিলাম যারা এ ধরনের বাহ্যিক আমল প্রদর্শনকারীদের জ্ঞানের খাটো বহরের প্রতি থুথু নিক্ষেপ করে। ঐ সব লোক তো আসলে মূর্খতার মোড়কে পুরো হয়ে আছে। দেখুন না, এরা ইমামদের সম্পর্কে কী বলে:

انهم بتقسيم البدعة فتحوا للبدع والمحدثات الأبواب على مصاريعها

'তারা বিদ্আতের প্রকারভেদ বের করে বস্তুত: বেদ্আত ও অভিনব বিষয়াদির দরজাগুলোর সব কটি কপাট খুলে দিল।' (পৃষ্ঠা ৫৮)

অথচ এ থেকে সেই মহান ব্যক্তিরা কতদূরে! কারণ, তাঁরাই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বাণীর উত্তম সমঝদার। তাঁরা আল্লাহ্কে অন্যদের চেয়ে বেশী ভয় করতো, অধিক মান্য করত। এত মারাত্মক অভিযোগের পরও ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন:

البدعة بدعتان محمودة ومذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم

–'বিদ্আত দু প্রকার- ভাল ও মন্দ। যা সুন্নাহ্ মোতাবেক হবে তা ভাল আর যা তার খেলাফ তা মন্দ।'

তাহলে কি তারা শাফেয়ী সাহেবকে উদ্দেশ্য করেই অপবাদ দিয়েছে, নাকি এ অপবাদ তারা দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাবকে দিল, যিনি বলেছেন- نعمت البدعة هذه –'কী ভাল বেদ্আত এটা!' এমন কথা ইবনে উমর থেকেও উল্লেখ আছে। তাহলে তারা দু জন কি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমান? কারণ, তাদের কথা দ্বারা বুঝা যায়

যে, বেদ্আত দু'প্রকার - নন্দনীয় ও নিন্দনীয়। তাছাড়া অধিকাংশ আলেমই এই ভাগ বিন্যাসকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে আছেন- নববী, ইব্ন আব্দুস-সালাম, আল্-ক্বারাফী, ইবনুল আরাবী, হাফেযদের সমাপ্তি ইবনে হাজার। তাহলে কি এইসব দিকপাল আলেমগন আল্লাহ্র বাণী– রাসূলের বাণী বুঝেন না? আস্তাগফেরুল্লাহ্ আল-আজীম: এই মিথ্যা অপবাদ থেকে ফানাহ্ চাই। এসব কেন হচ্ছে? কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বলেছেন- وكل بدعة ضلالة সব বিদআতই গোমরাহী। তাদের কাছে এই (وكل)শব্দটি সকল নতুন জিনিষকেই গোমরাহীতে শামিল করেছে । অথচ ঐ লেখক উসূলের নিয়ম-কানূনই জানে না। কারণ, আল্লাহ্র কালাম ও রাসূলের হাদীসে দেদার 'কুল্ল' আছে– ব্যাপকতা আছে– যা আমলের বেলায় সীমিত ব্যাপক, অথবা এমন ব্যাপক যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছুকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

এতসব সত্ত্বেও তাদের (আলেমদের) নিকট রয়েছে বিদ্আতের অন্য এক প্রকারভেদ ঃ

البدعة المكروهة تنزيها + البدعة المكروهة تحريا

البدعة المحرمة + البدعة المكفرة + البدعة المباحة

যে বিদ্আত মাকরূহে তানযিহী (সাধারণ অপছন্দীয়)

যে বিদ্আত মাকরূহে তাহ্রীমী (হারাম পর্যায়ের অপছন্দনীয়)

যে বিদ্আত হারাম

যে বিদ্আত কাফের বানায়

জায়েয বিদ্আত (বিদ্আতে মুবাহ)

এ পঞ্চমটিকে তারা এর অন্তর্ভুক্ত করছেন না।

কারণ তারা মনে করেন যে, বিদ্আত শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কারণ তারা এটাকে দু'ভাগে ভাগ করেন-দ্বীন বিষয়ক আর দুনিয়া বিষয়ক। মুবাহ যেন দ্বীনের বিধি-বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়। অথবা যেন ইবাদতের বাইরের বিষয়ে যে বিদ্আত তা এ হাদীস শামিল করে না। এটাও তো তাদের পক্ষ থেকে ঐ ব্যাপকতার এক ধরনের সীমা নির্ধারন– অথচ কোন সীমিতকরণকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। আর নবীজী বলেন– من احدث فى أمرنا ماليس منه فهو رد

–'আমাদের বিষয়ে যে এমন অভিনব কিছু করবে যা এর অন্তর্গত নয় তা প্রত্যাখাত।' অপর বর্ণনায়-'আমাদের দ্বীনে।' অথচ আল্লাহর শরীয়ত ও তার দ্বীন একজন মুসলিমের সকল ক্রিয়াকান্ডকে শামিল করে– চাই ইবাদত হোক, আচার-আচরণ হোক, তার বিভিন্ন হুকুম-আহকাম হোক, তার মামলা-মোকদ্দমা, বিবাহ-শাদী বা উত্তরাধিকার ইত্যাদি। আর এর প্রত্যেকটি বিষয়েই হারাম বিদআত অনুপ্রবেশের শেষ অবকাশ আছে। এ সব বিদ্আতের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে

আকীদা-বিশ্বাসে বিদ্আত যা কয়েকটি উপদল দ্বীন থেকে বের হয়ে বিশ্বাস পোষণ করে থাকে।

অনুরূপ আরেকটি বিদ্আত হচ্ছে- শাসনতন্ত্রে বিদ্আত। এরমধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে আল্লাহ্র শরীয়ত থেকে বের হয়ে যাওয়া, এই বিদ্আতকে কুফরী হিসেবেও আখ্যা দেওয়া যায়- যা কিনা অধিকাংশ মুসলিম দেশকে গ্রাস করেছে আর এ জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে ইসলামের দুষমন প্রাচ্যবিদ ও তাদের লেজুড়বৃত্তিকারীরা। এমনকি তারা মুসলমানদের তাদের শরীয়ত ও আকীদা থেকে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এবং তাদেরকে আইন কানূন নামের খোলসে খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির পায়রবী করতে বাধ্য করেছে।

কিন্ত বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যারা শাখা-প্রশাখা মাসলা-মাসায়েল নিয়ে বিতর্কের অবতারণা করে থাকে এবং এতে তাদের সাথে বিমতকারীদের বেদ্আতী বলে ফতোয়া দেয় অথচ বড় মাসআলা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাদের কোন আওয়াজই নেই অথবা একটি অক্ষরও পাওয়া যায় না-যে বিষয়ে দেশে দেশে মুসলমানরা বিপদে পড়ে আছে। অথচ ঐ বিষয়ে আমল করা এ সময় ফরজে আইন। আর এতে করে তাদের ব্যাপারে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন। কারণ এখতেলাফি শাখা মাসআলাগুলো সম্পর্কে পানি ঘোলা করা- যা বহু পূর্বেই মুসলমান ও মাযহাবী ইমাম অনুসারীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি করে রেখেছে। এটা নিয়ে একটা হৈ চৈ বাধিয়ে দিতে পারলে- বিশেষ করে এ যুদ্ধে একটি বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে এবং আর কখনো ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। বিভেদের কারণ হচ্ছে পরস্পারিক সংঘাত, ঘৃণা, অপবাদ বিনিময়, বেদআত ও গোমরাহী বলে জিগির তোলা। অথচ এতে মুসলমানদের কোন ফায়দা নেই।

বস্তুতঃ কুরআন ও সুন্নাতে বহু ব্যাপকতা ব্যঞ্জক বাণী আছে। তবে এর সবগুলোতেই সীমিতকরণ ঢুকেছে। অথবা সেগুলোতে কিছু 'এমন আম (ব্যাপক) আছে যার দ্বারা আসলে' নির্দিষ্ট কিছুকেই বুঝানো হয়েছে।' যেমন আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- تدمر كل شئى باذن ربها

-'তার প্রভুর নির্দেশে সবকিছু মেস্মার করে দিচ্ছে।' অথচ এটা নিশ্চিত যে, তা পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহকে ধ্বংস করে নি। আল্লাহ্তায়ালার আরেকটি বাণী- وإن ليس للانسان إلاماسعى

'মানুষের জন্য ততটুকুই যা সে চেষ্টা করেছে।' অথচ অনেক দলীল প্রমাণ আছে যা তাওয়াতুর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, একজন মুসলিম তার অন্য মুসলিম ভাইবোনের আমল দ্বারা উপকৃত হতে পারে, ফেরেশ্তাদের দোয়ায় উপকৃত হতে পারে। যেমন শেখুল ইসলাম ইব্ন তাইমিয়া এটাকে প্রায় বিশটিরও বেশী দলীল দিয়ে প্রমাণিত করেন। যেমন-সালাতে জানাযাহ্! মৃত ব্যক্তির পক্ষে সদকা করা, মু'মিনদের দু'আ।

এছাড়া ব্যাপকতা ব্যাঞ্জক ভাষ্য দ্বারা যে সুনির্দিষ্ট কিছুকেই বুঝানো হয়েছে এমন একটি হাদীস হচ্ছে- وفى الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام -'কালোদানা শুধু মৃত্যু ছাড়া সব রোগের অষুধ (বুখারী সঙ্কলিত)।' অথচ সকল ব্যাখ্যাকার একমত যে হাদীসটি তার বাহ্যিক ব্যাপকতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যদিও এতে 'কুল্লু' শব্দ দ্বারা বাহ্যত সব কিছুকে শামিল বুঝা যায়।

এ ধরনের আরেকটি হাদীসে আছে-মুসলিম সঙ্কলিত। -'রাসূলুল্লাহ্ (দ:) কে বলতে শুনেছি -

لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها -'যে সূর্য উঠার আগে ও সূর্যাস্তের আগে নামায পড়ে সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না।'

নিঃসন্দেহে এটা ছিল ব্যাপকতা ব্যঞ্জক ভাষ্য। অথচ এ দ্বারা তার বাহ্যিক ব্যাপকতা গ্রহণ একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে ব্যক্তি ঐ দুটি সালাত- ফজর ও আসর পড়ল, আর এ দুটোর বাইরে সব সালাত ও অন্যান্য ফরজ বাদ দিল তাকে নিশ্চয়ই এ সুসংবাদ দেওয়া হয় নি। বরং এটি এমন ব্যাপক ভাষ্য যা তার বাহ্যিক অর্থে ব্যহৃত নয়। এটা দ্বারা সুনির্দিষ্ট কিছুকে বলা হয়েছে। অথবা এটা এমন 'আম' যা অন্য দলীল দ্বারা সীমায়িত হয়েছে।

"তাইবী বলেন- যা হাফেয ইবনে হাজার সঙ্কলন করেন এবং সমর্থন করেন: কয়েকটি হাদীস যদি প্রামাণ্য হয় তাহলে হাদীসগুলোকে পরস্পর মিলায়ে দেখতে হবে। কারণ, একই প্রসঙ্গের সবগুলো হাদীস মূলত: একই হাদীসের স্থানে গণ্য করতে হবে। একটির সাধারণ ভাষ্যকে অপর হাদীসের ভাষ্যে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আরোপ করতে হবে। এতে করে উভয় হাদীসের মর্মের উপরই আমল করা হবে।"

যে আম (ব্যাপক) দ্বারা খাস (নির্ধারিত) বুঝানো হয়েছে তার একটি প্রমাণ হচ্ছে, 'মহান আল্লাহ্র বাণী-

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم -'যাদেরকে লোকেরা বলল: 'লোকেরা তোমাদের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে।'

উপরোক্ত আয়াতে (الناس) 'লোকেরা' বলতে ঐ সীমিত সংখ্যক লোকদেরই বুঝানো হয়েছে যারা খবরটি দিয়েছিলেন আর দ্বিতীয় (الناس) 'লোকেরা' বলতে বুঝানো হয়েছে- আবু সুফিয়ান এবং মক্কার একদল মুশরিক যারা ওহুদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল- তারা নিঃসন্দেহে দুনিয়ার সকল মানুষ ছিল না (বরং কিছু সংখ্যক ছিল)।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্র বাণী- إنكم وماتعبدون من دون الله حطب جهنم -'তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদত করে থাক- আল্লাহ্কে ছেড়ে- সবই জাহান্নামের ইন্ধন।'

আমরা জানি, 'যাদের' শব্দটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক পদ। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঈসা (আ:) ও তাঁর মা এবং ফেরেশ্‌তাগনের ইবাদত অনেকে করছেন ও করেছেন, কিন্তু সে কারণে তারা জাহান্নামে জ্বলবে না। কাজেই আয়াতে 'যাদের' (الذين) শব্দটি ব্যাপক অর্থে হলেও এখানে তা ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের শামিল করবে না। এটা ঐ ধরনের একটি ব্যাপক শব্দ যার অর্থ নেওয়া হয়েছে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট কাউকে বা কিছুকে।

এ ধরনের আরেকটি বাণী হচ্ছে–

فلما نسوا ماذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شئى –'যখন তারা ভুলে গেল, যা তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম।'

উপরোক্ত আয়াতে كل شئ – 'সব কিছু' বলা হলেও নিশ্চয় রহমতের দরজা খোলা হয় নি। এ ধরনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে বললেন ঃ وشاورهم فى الأمر

'এ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।'

আমরা জানি, তিনি তাদের সাথে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে কোন পরামর্শ নিতেন না। ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণিত:وشاورهم فى الأمر অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে। এটা এই আয়াতের ব্যাখ্যা... যখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) কোন বিষয়ে দৃঢ় সংকল্প নিতেন তখন কার এমন সাধ্য যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর কথা বলে।'[১]

এমনিভাবে মহান আল্লাহ্‌র বাণী–

لتجزى كل نفس بما تسعى –'যাতে প্রতিটি প্রাণী তার প্রচেষ্টার প্রতিদান লাভ করে।'[২]

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে এ ধরনের বহু 'নির্ধারিত ব্যাপকতা' বা এমন ব্যাপক যা দ্বারা নির্ধারিত কিছুকে বুঝানো হয়েছে-এমন দেদার উদাহরণ রয়েছে যা সঙ্কলন করলে পূর্ণ এক খন্ড গ্রন্থের দরকার হবে।

তাহলে ঐ লেখক সাহেব বিশিষ্ট পন্ডিত আলেমদের অধিকাংশের অভিমত কিভাবে প্রত্যাখান করতে পারেন? তাঁরা সঠিকভাবেই– كل بدعة ضلالة –এ হাদীসকে নির্দিষ্ট ব্যাপক বা এমন 'ব্যাপক যার দ্বারা নির্ধারিত কিছুকেই বুঝানো হয়েছে' বলে মত পোষণ করে। অথচ হেওয়ায় লেখক– আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন–তাদেরকে তাদের ঐ অভিমতের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমান বান্দাহ্ হিসেবে গণ্য করেছেন। অথচ তারা এ অভিযোগ থেকে কত দূরে!

রাসূলাহ্‌র বাণী 'কুল্লু বিদআতিন দ্বালালাহ كل بدعة ضلالة এর ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন:[৩]

(১) দ্র: ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা ১০৩ খন্ড ১৭

(২) কিছু বিষয় আল্লাহ মাফ করেন না। আর যাদের মাফ করবেন তারা এই 'কুল্লু' এর ব্যাপকতার অন্তর্ভূক্ত।

(৩) দেখুন ঃ সুনানে নাসাঈ-এর টীকা, কৃত– সায়ূতী পৃঃ ২৩৪ খ. ২

এটি সীমিত ব্যাপক (عام مخصوص) –অর্থাৎ এ হাদীসে উল্লেখিত বেদআত হচ্ছে সে সব নব উদ্ভাবিত বিষয়াদি যার শুদ্ধতার পক্ষে শরীয়তে কোন প্রমাণ মেলে না।

হাফেয আবু বকর ইবনুল আরাবী তার প্রণীত 'সুনানে তিরমিযীর ব্যাখায়' বলেন–

"সপ্তমত: তাঁর (দ:) বাণী ঃ اياكم ومحدثات الامور এ প্রসঙ্গে জেনে রাখুন, আল্লাহ্ আপনাদের জ্ঞান দিন– মুহদাস (নতুন কাজ) দু প্রকার ১) এমন নয়া কাজ যার পিছনে স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়া কোন ভিত্তি নেই। এটা অকাট্যভাবে বাতিল: অর্থাৎ সেটি গোমরাহী (البدعة الضلالة)। ২) আরেক প্রকার নয়া কাজ হলো, একটি নজীরের উপর আরেকটি নজীরকে আরোপ করা। আর এটাই হচ্ছে খোলাফা ও মহান ঈমামদের রীতি ও আদর্শ। তিনি বলেন- মুহদাস ও বিদআত শব্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই নতুন কিছুকে খারাপ বলা যায় না। অথবা এ দুটোর অর্থের কারণেও নয়। কেননা, আল্লাহ্ তায়ালা বলেন-

ما يأتيهم من ذكر من ربّهم محدث তরজমা : তাদের কাছে তাদের প্রভুর নিকট থেকে নতুন কোন পুরুষ আসে না।

ওমর (রা:) বলেন: نعمت البدعة –'কী ভাল বিদআতই না!' কাজেই ঐ বিদ্‌আতকেই খারাপ বলব যা সুন্নাতের খেলাফ হবে। আর মুহদাসের সেটাই খারাপ যা গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে সার কথা– যার ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ (রা:) 'মুহদাস' কে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– মাহমূদ ও মাযমূম– নন্দনীয় ও নিন্দনীয়।

এমনিভাবে শাফেঈর পরবর্তী ইমামগন যেমন, আলেমকুল শিরমণি ইজ্জ বিন আব্দুস-সালাম (শাফেঈ), ইমাম নববী, ইবনে আসীর (শাফেঈ), ইমাম ইবনুল আরাবী ও ক্বারাফী(মালেকী) ও অন্যান্য অনেকে যাদের শেষব্যক্তি হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী -তারা সবাই মুহদাসকে দু ভাগে ভাগ করেছেন–প্রশংসনীয় ও মন্দ। এর উপর পাঁচ ধরনের হুকুমই বর্তাতে পারে। এটা তার ভিত্তিমূলের বিচারেই নির্ধারিত হবে। নির্ধারিত হবে এর অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে – কি, তার পক্ষে যায়, না বিপক্ষে, বা এটা কোন কল্যাণ বয়ে আনবে, নাকি অকল্যাণ, অথবা এটা কি শরীয়ত সম্মত নাকি শরীয়ত বিরোধী।

পবিত্র সুন্নাহ্‌কে এর মূলনীতি তথা উসূল ফিকাহ্ সমেত ভালভাবে যিনি বুঝেন ও জানেন তার উপরোক্ত বিষয়ে একমত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

আর এটা কেবল তার পক্ষেই সম্ভব যার এ বিষয়ে রয়েছে বিশেষ ব্যুৎপত্তি, সঠিক বিশ্লেষণ শক্তি এবং শরীয়তের আবেদন সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্য। আর সেটা তো এমন কারো থাকার কথা নয়, যে কেবল লম্বা লম্বা দাবী করে থাকে অথচ জ্ঞানের একটি পলক ছাড়া কিছুই জানে না। যখনই কোন একটি দলীল পেয়ে বসে তা-ই আঁকড়ে ধরে এবং এ ছাড়া আর যত দলীলাদি রয়েছে সব কিছুকে ছুঁড়ে মারে। অপরাপর মূলনীতি, সূত্র,

মর্ম ও জ্ঞানীদের সারগর্ভ অভিমত এবং সাহাবা কেরাম ও তৎপরবর্তীদের মতামত এসব কিছুকেই হয় অজ্ঞানতাবশত: নয়তো অজ্ঞানের ভান করে দূরে ঠেলে দিয়ে এ ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, তার ঐ দলীলটি বা মতটিই হচ্ছে শুদ্ধ ও সঠিক। এর বাইরে সব ভুল। ঠিক ঐ লেখকের মত। আল্লাহ্ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন!১

আল্লাহর রাসূল (দ:) ঠিকই বলেছেন যে, من يرد اللهّ به خيرا يفقهه فى الدين –'আল্লাহ যার ভাল চান, তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন।

হাদীসটির মর্ম খুবই পরিষ্কার যে, যার ভাল চান না তাকে দ্বীনের জ্ঞান দেন না। কাজেই সে গন্ড মূর্খতার মধ্যে নিপতিত হয় এবং আলেমদেরও ভুলে যায়। আমরা জানি, দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান ও পান্ডিত্য মানুষকে দেয় সন্ধানী দৃষ্টি এবং দলীল প্রমাণাদির তালাশ। এরপর সে একটি প্রামাণ্য দলীলকে আরেকটির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে থাকে। এবং পারতপক্ষে আল্লাহর বাণী ও রাসূলের বাণী উভয়ের উপরই আমল করতে চেষ্টা করে। প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে মুসলিম আলেমদের কর্ম ও বাণীকে পারতপক্ষে ভাল বলেই সাব্যস্ত করতে প্রয়াসী হয়। কারণ, আমরা তো মুসলমানদের সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করার জন্যই আদিষ্ট। বরং এটা তো দৃঢ় ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ। যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এরপর দলীল প্রমাণ অন্বেষণের সাথে সাথে বিশিষ্ট পন্ডিত আলমগনের অভিমত সম্পর্কে অবহিত হওয়াও তার জন্য জরুরী। কারণ, তারা বেশী জ্ঞানের অধিকারী এবং বুঝা ও পরহেজগারীর দিক থেকে উত্তম । কাজেই এ সব দলীলাদি সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে– কীভাবে তারা প্রামাণ্য দলীলাদির মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন বা সম্পূরক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর পর জানতে হবে সাহাবা কেরাম- এর বাণী ও অনুশীলন যা দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা যায়। কেননা তাঁরা তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরবর্তীদের চেয়ে বেশী সমঝদার। ধর্মীয় পন্ডিতদের এটাই ছিল নিয়ম। এজন্যই তাদের সিদ্ধান্ত বা গবেষণালব্ধ মতামতকে কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণের বিরোধী পাওয়া যাবে না। পাওয়া গেলেও সেটা অন্য কোন বিরোধী দলীলের কারণেই হবে। কোন বাহ্যিক অর্থবোধক দলীলের বিরোধিতাও কেবল যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার মাধ্যমেই করা হয়েছে, যা প্রকৃত অর্থে বিরোধিতা নয়। এজন্যই তাদের কাউকে দেখতে পাবেন না যে, তার বিরোধিতাকারীকে বেদ্আতী বা গোমরাহ্ বলে অপবাদ দিচ্ছেন। কারণ, তিনি জানেন যে, তারও কিছু দলীল-প্রমাণ আছে যা তার কাছে অগ্রাধিকার পাবার মত, যদিও তা অপরের বিচারে অগ্রাধিকার পায় না। এজন্যই তাদেরকে দেখা যায় না যে কাউকে ঢালাওভাবে বেদ্আতী বলছে। হ্যাঁ, যারা আকীদায় পথভ্রষ্ট কেবল তাদেরকে তা বলা

(১) আবদুর রায্যাক-মা'মারযুহরী-উবাইদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণিত যে ইবনে মাসউদ (রা:) বলেন: 'একজন হাদীস বর্ণনা করার সময় এমন কেউ হাদীস শুনবে, যে সেই হাদীস হৃদয়ঙ্গম করতে অপারগ, তখন এটা তার জন্য একটা বিপর্যয় ডেকে আনবে।' সত্যিই, ইবনে মাসউদ ঠিকই বলেছেন। দেখুন-মুসান্নাফ, পৃ: ২৮৬, খন্ড: ১১।

হয়েছে। অবশ্য সে ক্ষেত্রেও তাদের কাফের ফতোয়া দেয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্য নাই আর মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল। সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়। হ্যাঁ, যদি কেউ দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত দ্বীনের কোন বিষয়কে অস্বীকার করে, সে তো নিজেই নিজের কুফরীকে ঘোষণা করে দিল। কারণ, সে ব্যাপারে কোন ব্যাখার অবকাশ থাকে না।

আর আকীদা সম্পর্কে ভ্রষ্ট দলগুলোকে (যেমন বাতেনিয়া, কাদ্রিয়া, খারেজী), বেদ্আতী বা গোমরাহ বলার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত ঐকমত্য (اجماع) পোষণ করেন যে, তারা বেদ্আতীও গোমরাহ্। কারণ, এদের ভ্রান্ত আকীদা সম্পর্কে অজস্র প্রমাণাদি দ্ব্যার্থহীনভাবে প্রমাণিত। এদের মধ্যে খারেজী সম্প্রদায়ের বেদ্আতই সর্বপ্রথম প্রকাশ লাভ করে এবং এত চরমে পৌছে যে, তারা আমীরুল মো'মেনীন আলী (রা:) ও তাঁর অনুসারী সাহাবীদের কাফের বলে ঘোষণা করে। তাদের দলীলগুলো ছিল ঐ সব আয়াতের বাহ্যিক অর্থ যা আসলে নাযিল হয়েছিল মুশরিকদের উদ্দেশ্যে। তারা তাদের আকীদা বিরোধীদের কাফের বলে প্রচার করেছিল এবং তাদের বিরোধীদের রক্ত ও সম্পদকে হালাল ঘোষণা করে গণহত্যা ও লুন্ঠন করেছিল।

ইবনে মারদুবিয়া– মোসআব ইবনে স'াদ সূত্রে, বর্ণনা করে বলেন যে, একবার এক খারেজী ব্যক্তি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা:) এর প্রতি লক্ষ্য করে বলল– 'এ হচ্ছে কাফেরদের সর্দার।' তখন সা'দ উত্তর করলেন– 'মিথ্যাবাদী! বরং আমি কাফের সর্দারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি! তখন তাদের আরেক জন বলল– 'এ সর্ব নিকৃষ্টকাজের হোতা।' তখন সা'দ বললেন– তুমি তো اولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقائه –এ আয়াতকে অস্বীকার করলে!। (এটি উল্লেখ করেছেন হাফেয আসকালানী তার ফাতহুল বারী গ্রন্থে) ।১

তাবরানী তার কবীর ও আওসাতে বর্ণনা করেন যে, আম্মারাহ বিন ক্বারাদ একবার একটি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি একুশ দিন ছিলেন। ফেরার পথে তিনি যখন আহ্ওয়াযের নিকটবর্তী হলেন তখন আযানের ধ্বনি শুনতে পেয়ে বললেন, আল্লাহ্! তিনমাস ধরে মুসলমানদের সাথে জামাতে সালাত আদায় করতে পারি নি (এবার বুঝি সুযোগ হলো)। এ বলে তিনি আযানের ধ্বনী অনুসরণ করে সালাত আদায়ের জন্য সেদিকে পা বাড়ালেন। পৌঁছে দেখেন এরা আফারেকা (খারেজীদের একটি উপদল)। তারা তাঁকে দেখে বললো– রে আল্লাহ্র দুশমন! এখানে এলে কেন? তিনি উত্তর করলেন - আরে! তোমরা কি আমার ভাই নও? তারা উত্তর করল, তুমি তো শয়তানের ভাই, তোমাকে আমরা অবশ্যই হত্যা করব। তখন তিনি বললেন– তোমরা কি আমার ঐ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে না যাতে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন?

(১) দেখুন– পৃ: ৪০, খন্ড: ১০, ফাতহুল বারী।

তারা বললো– কী সে ব্যাপার যার জন্য তোমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন? আমি কাফের অবস্থায় তার কাছে এসে সাক্ষ্য দিলাম: আল্লাহ্ ছাড়া মা'বুদ নাই এবং তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন তিনি (দ:) আমাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন– এতে তারা কর্ণপাত না করে তাকে ধরে হত্যা করে ফেলে। মাজমাউয –যাওয়ায়েদে বলা হয়েছে যে, এ হাদীসের সনদে বর্ণিত ব্যক্তিগণ সহীহ সনদের ব্যক্তিত্ব।১

এই তে সেই গোমরাহী বেদ্আত। আর এটাই এর অনুসরণকারীদের কাছ থেকে যুগে যুগে সংঘটিত হয়েছে। এরা এসেছে এদের আত্ম-প্রবঞ্চনার পথ ধরে। তারা সব সময় আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থটিই গ্রহণ করেছে। তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে সত্যপন্থী দেখে না এবং যারাই তাদের বিরোধিতা করেছেন তারাই এদের নিকট গোমরাহ বেদ্আতী অথবা কাফের মুশরিক। বরং এরা নিজেদের লোকছাড়া কারো কথা মন দিয়ে শোনতেও চায় না এবং অধিকাংশ ইমামদের প্রতি কালো চশমা এঁটে বাঁকা চোখে দেখে থাকে। কাজেই তারা তাদের চোখে হয় বেদ্আতী নয়তো ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত মুশরিক।

আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলা যে, একজন মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য মুসলমান সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা। উম্মতের আলেম সম্প্রদায় তো তারও উর্ধে। কেননা বিতর্কিত কোন ছোটখাট মাসআলা নিয়ে এমন কিছু হৈ চৈ করা–যাতে সে সব মহান মুজতাহিদ আলেমদের প্রতি খারাপ মনোভাব সৃষ্টি হয় অথবা অপপ্রচার পায়– এ কাজটি দ্বীনের জন্য খুবই ধ্বংসাত্মক এবং এক উম্মাহ্ চেতনায় বিরাট ধ্বস সৃষ্টি করে। অথচ ইস্লামের প্রাথমিক যুগ থেকেই শাখা–প্রশাখা বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ চলে আসছে–চাই তা হোক আকীদাগত বিষয় বা পারস্পারিক সম্মান, সংহতি ও সহানুভূতির বিষয়। তারা সবাই ধর্মানুরাগী এবং ধর্মের মর্যাদা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঐ সব নব্য পন্ডিতমন্যদের ধারণা অনুযায়ী নয়, যারা নিজেদেরকে ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত ও গবেষক মনে করেন অথচ তারা হচ্ছে সবচে অজ্ঞ ব্যক্তি।

তাদের কাছে ইজতেহাদ গবেষণার আদৌ কোন উপকরণ নেই, যা আছে তা হচ্ছে শুধু মুখে দাবী করা। প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে এমন কিছু বিভ্রান্ত লোকের অন্ধ অনুকরণকারী– মোকাল্লেদ যারা এই উম্মতের মধ্যে এমন কিছু তীব্র সমালোচনা ছুঁড়ে দিয়েছে সেই সব বিশ্ববরেণ্য আলেমদের ইজতেহাদের প্রতি, যাদের জ্ঞান, পান্ডিত্য এবং পরহেযগারী সম্পর্কে এক সময় গোটা উম্মত সাক্ষ্য দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। তারা ছিলেন– শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র:) এর বর্ণনা মতে –এই মুসলিম উম্মাহর সত্যিকার মুখপাত্র (لسان صدق)। তাঁর গ্রন্থ جواب أهل العلم এ কিছু বেদ্আতী লোকের দায়িত্বহীন উক্তির প্রতিবাদের প্রেক্ষাপটে তাঁর বক্তব্য দেখুন। তিনি বলেন: 'মূলকথা, এ দুটি কথার মধ্যে

(১) মাজমাউয যাওয়ায়েদ– পৃ: ২৬ খন্ড: ১।

একটিও সালফে সালেহীন তথা সাহাবা ও তাবেঈন থেকে বর্ণিত হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি এ ধরনের উক্তি কোন সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম আলেম– যার জ্ঞান ও পরহেযগারী সম্পর্কে সুখ্যাতি রয়েছে– তার থেকে প্রকাশ হতে পারে না। তাঁরা ছিলেন উম্মতের সঠিক মুখপাত্র। এমন কথা না তো আহ্মাদ বিন হাম্বলের যমানায় হতে পারে, আর না তো শাফেয়ী বা আবু হানিফার যমানায়, আর না তো তাদের আগের কেউ বলতে পারে।১

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা:) ঠিকই বলেছেন– তোমাদের কেউ তার ধর্মের ব্যাপারে কোন লোককে এমনভাবে অনুকরণ করবে না যে, সে ঈমান আনলে তুমি ঈমান আনবে, সে কুফরী করলে তুমিও কুফরী করবে। যদি তোমরা অনুসরণ করতে চাও তাহলে প্রয়াত কোন ব্যক্তির অনুসরণ করবে– জীবিতের নয়। কারণ জীবিত ব্যক্তি যে, কোন ফেতনায় পড়বে না তার গ্যারান্টি নেই।"২

এ কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলিম যুকব যুবতীদের আল্লাহ্র রাসূল সম্পর্কে এমন উক্তি করা থেকে সতর্ক করা যে সম্পর্কে তার জ্ঞান ও উপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করে নি। যাতে খারেজীদের রাস্তায় চলা শুরু না করে– যারা তাদের মনগড়া মতবাদ ও আয়াতের বাহ্যিক ব্যাপকতার উপর ভিত্তি করেই এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের গোমরাহ বলে অভিহিত করে বসেছে। অথচ তাদের কাছে এই সব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ ছাড়া প্রমাণ স্বরূপ আর কিছুই নেই। সে সব ক্ষেত্রে এ ধরনের লোকেরা প্রায়শ ভুল করে থাকে। কাজেই মুসলিম জাহানের যুগবরণ্যে আলেমদেরকে বেদআতী ও গোমরাহ বলার তার কোন অধিকার নেই। তার অনুসারীদেরও নেই। কারণ, বিষয়টিতে আদৌ আলেমদের কোন ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কারণ, বেদআত-এর সংজ্ঞা নিরূপণে আলেমদের মধ্যে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে।

তাদের কেউ কেউ এটাকে ব্যাপকভাবে নিয়েছেন। অথচ ব্যাপকতা এখানে খুবই মারাত্মক ব্যাপার। কারণ, এতে করে অনেক সাহাবী, তাবেঈ বা পরবর্তীদেরকে এতে নিপতিত হয়েছেন বলে সাব্যস্ত করা হয়।

আলেমদের কেউ কেউ আবার এটাকে বিভাজন করেছেন বা 'সুনির্দিষ্ট খাস' করেছেন যাতে এ ধরনের অনভিপ্রেত অবস্থার মধ্যে না পড়েন। কিছু বিভাজনকারী বলেছেন– বেদ্আত দু'প্রকার (১) প্রকৃত বেদ্আত' (২) আপেক্ষিক বেদ্আত ইত্যাদি ইত্যাদি, যার কিছুটার প্রতি পরবর্তীতে আমরা ইঙ্গিত করব। প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব

(১) দেখুন– জাওয়াব আহলিল ইল্ম, পৃষ্ঠা: ২৩।
(২) বর্ণনা করেছেন তাবরানী তার "কাবীর" গ্রন্থে। মাজমাউয যাওয়ায়েদ– এ বলা হয়েছে যে, রাবীগণ সহীহ রাবী। দেখুন– মাজমা' পৃ: ১৮০, খন্ড: ১।

দলীল-প্রমাণ। কাজেই বিতর্কের সময় যে কোন ধর্মানুরাগী জ্ঞানী ব্যক্তিরই কর্তব্য হচ্ছে আলেমদের বিভিন্ন অভিমত উপস্থাপনের পর একটা সীমায় এসে অবস্থান নেওয়া যা স্বয়ং শরীয়ত প্রবর্তক নির্ধারণ করেছেন। এছাড়া খারেজী ও অনুরূপ সম্প্রদায় থেকে এই অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত যে, তারা অনেক সহীহ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের দ্বারা গোমরাহ্ হয়ে গেছে। কারণ, তারা এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে, তারা যে বিশ্বাস করে সেটাই সঠিক। শুধু তাই নয় বরং তারা তাদের মতবিরোধী সাহাবী ও পরবর্তী আলেমদেরকে গোমরাহ বলে মনে করে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ (দ:) তাদেরকে আগেই দোষারোপ করে গেছেন এবং হুকুম জারী করেছেন যে এরা দ্বীন থেকে দূরে হেঁটে চলে গেছে। যদিও বাহ্যত: তারা সবচে বেশী ধর্মানুরাগী বলে প্রতীয়মান হতো এবং কঠোরভাবে ইবাদত করতো। কিন্তু তারা ধ্বংস হলো তাদের আত্ম-অহংকারে ও বিরোধীদের গোমরাহ অভিহিত করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন– আবু সাঈদ খুদরী (রা:) বলেন– রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বলেছেন– 'আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে একটি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হবে যারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা হলকুমের নীচে যাবে না। তারা আহলে ইসলামদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারীদের ছেড়ে দিবে। দ্বীন থেকে তারা এমন করে সটকে পড়বে যেমনি ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তীর সটকে পড়ে। আমি যদি পেতাম তাহলে অবশ্যই তাদেরকে আ'দ জাতির মত (অথবা বিদ্রোহীর মত) হত্যা করতাম।

ইমাম বুখারী বলেছেন– ইবনে ওমর (রা:) তাদেরকে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি বলে মনে করতেন। তিনি বলেন– তারা কাফেরদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ আয়াতগুলোকে মুমিনদের উপর আরোপ করেছিল। বুখারী এটাকে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেন। তবে হাফেয তাঁর ফাতহুল বারীতে বলেন যে, তাবরানী তাঁর তাহ্যীবুল আসার– এ সহীহ সনদ দ্বারা এটিকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে সনাক্ত করেন।

হুযাইফা সূত্রে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বলেছেন, আমি যা তোমাদের জন্য ভয় করছি তা হচ্ছে, একজন লোক কুরআন পড়বে এরপর যখন তার ঐশ্বর্য ঐ লোকটির মধ্যে প্রতিভাত হবে, তখন সে তার ইসলামের চাদর থেকে বের হয়ে আসবে এবং তা তার পিছে ছুড়ে ফেলবে এবং নিজ প্রতিবেশীর উপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং মুশরেক বলে তাকে অপবাদ দিবে। আমি বল্লাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এ দুজনার মধ্যে ঐ শিরকের জন্য কে বেশী যোগ–ফতোয়াদানকারী, না কি যাকে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেন, যে এই অপবাদ দিয়েছে।' হাফেয ইবনে কাসীর বলেন– এ হাদীসের সনদ ভাল।

বুখারী ও মুসলিম, ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বলেন:

«من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فان كان كما قال وإلا رجعت عليه»

–'যদি কেউ তার অন্য ভাইকে বলে, হে কাফের! তাহলে তাদের দুজনের একজনের জন্য তা নির্দিষ্ট হয়ে গেল। যদি সে আসলেই কাফের হয় তাহলে তো হলো, নইলে যে বলেছে তার দিকেই ফিরে আসবে।'

উভয় ইমাম আবার আবু হোরায়ারা (রা:) থেকে বর্ণনা করেন– তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দ:) কে বলতে শুনেছেন "কেউ যদি কাউকে কাফের বলে ডাকে অথবা বলে, ওহে আল্লাহ্র দুষমন ! অথচ সে তেমন নয়, তাহলে ঐ কথা তার দিকেই ফিরে আসবে।'[১]

তাবারী তার কাবীর গ্রন্থে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর থেকে উত্তম (হাসান) সনদে বর্ণনা করেন–

كفوا عن أهل لا اله إلا الله لاتكفروهم بذنب –'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ওয়ালাদের থেকে সংযত থাক। কোন পাপের কারণে তাদের কাফের সাব্যস্ত করো না।'

অপর বর্ণনায় রয়েছে– কোন কর্মের কারণে তাদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দিও না, যেমন– কুফর, শিরক, আল্লাহ্র দুষমন (লাআন্নত) যেমনটি হাদীসে এসেছে। এমনি করে বেদআতী ও গোমরাহ বলা– এ দুটো কুফর ও শিরকের অনুষঙ্গী।

আর খারেজী ও তাদের পথের পথিকদেরমধ্যে উল্লেখিত বেদ্আতী গোমরাহী বলার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়ার সাধারণ কারণটি হচ্ছে– ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, অজ্ঞানতা ও শরীয়তের মৌল উদ্দেশ্য সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির অভাব। এর সাথে যোগ হয়েছে– তাদের আত্মম্ভরিতা এবং শরীয়তের সব কিছু জানার মিথ্যা দাবী। এর জন্যই এই সম্প্রদায় নিজের আকীদার বাইরে কোন সত্য দেখতে পায় না। তারা আলেমদের মতামত ও সমজ বুঝকে আদৌ পাত্তা দিতে চায় না এবং তাদের বিরোধিতার আদৌ কোন মূল্যায়ন করে না। আর এটাই হচ্ছে গোঁড়া খারেজী সম্প্রদায়ের মূল চেতনা। যে জন্য শরীয়তের প্রবর্তকের পক্ষ থেকে তাদের নিন্দে করা হয় তা হচ্ছে তাদের নিজেদের নিয়ে আত্মপ্রসাদ ও শ্লাঘা প্রকাশ করা আর অন্যদের তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করা। এটা তাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা নির্দ্বিধায় বিপক্ষ আলেমদের ঢালাওভাবে কাফের গোমরাহ ইত্যাদি ফতোয়া দিয়েছে এবং তাদের পবিত্র রক্তকে হালাল মনে করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। তারা কখনোই এর সম্ভাব্য কোন ভাল উদ্দেশ্য খোঁজে বের করার এতটুকু চেষ্টাও করে নি, যা কিনা ইসলামেরই একটি অমোঘ চেতনা এবং এই চেতনার ভিত্তিতেই রাসূলুল্লাহ (দঃ) তাঁর সাহাবাদের দীক্ষিত করে তুলেছিলেন। যাতে বিতর্ক ও মতবিরোধ দেখা দিলেও তাদের ঐক্য বিনষ্ট না হয় অথবা পরস্পরের মধ্যে ভুল

(১) এ সব হাদীস সঙ্কলিত হয়েছে আল্লামা মোহাদ্দেস ও উসূলী জনাব আলী বিন মোহাম্মদ বিন্ ইয়াহ্ইয়া আলবী আল হাদরামী- এর পান্ডুলিপি থেকে।

বুঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়। এ থেকে আমাদের মহান আলেমগন এই অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা কিতাব ও সুন্নার বুঝার ব্যাপারে নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেও অপর আলেমের মতকে সম্মান দেখাতেন এবং পূর্ণ বিশ্বস্থতার সাথে তা উল্লেখ করতেন।

আবুল কাসেম আল্ ইসপাহানী তার 'তারগীব ও তারহীব' গ্রন্থে এবং খতীব তার "আল্ মোত্তাফাক ওয়াল মোফতারাক" গ্রন্থে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রাঃ) দশটি নীতিমালা নির্ধারণ করে শাসন কাজ চালিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল ঃ তোমার ভাইয়ের ব্যাপারটি তার সবচেয়ে ভাল কাজটির সাথে তুলনা কর তাহলে তার কোন কাজে তুমি সন্তুষ্ট হয়েও যেতে পার। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের মুখ নিঃসৃত কোন বাক্যের ভাল কোন অর্থ খোঁজে পাও ততক্ষণ পর্যন্ত এর খারাপ অর্থটি গ্রহণ করবে না.....। কজেই মহান আল্লাহ্ সর্বশক্তিমানের নিকট এই প্রার্থনা, যেন তিনি আমাদের যুব সমাজ ও বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে এই খারাপ চেতনা থেকে দুরে রাখেন এবং তিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন যাতে তারা তাদের দ্বীনকে বুঝতে সক্ষম হয় এবং তাদের মহান পূর্বসূরী ও আলেমদের নিয়ে গর্ব করতে শেখে, যারা আমাদের কাছে এই মহান দ্বীনকে পৌঁছে দিয়েছেন এবং তাঁদের মূল্যবান জীবন ও সুদীর্ঘ বয়স ক্ষয় করেছেন যাতে আমাদের কাছে এমন মহান ঐতিহ্য পৌঁছে যা দিয়ে ইসলামী উম্মাহ্ গর্ব বোধ করতে পারে। এমন এক ঐতিহ্যের কথা বলছি যার নযীর পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকটি নেই। কী ধর্মতাত্বিক ব্যুৎপত্তি সঙ্কলনে, কী সমালোচনায় আর কী চিন্তা গবেষণা ও সঙ্কট উত্তরণে–সর্বক্ষেত্রে এই বিরাট ঐতিহ্য আমাদের আজকের অহংকার। হাস্‌বুনাল্লাহু ওয়া নে'মাল ওয়াকীল।

এখান থেকেই আমরা ফিরে যাচ্ছি সেখানে, যেখান থেকে শুরু করেছিলাম যে, সুন্নাত ও বিদ্‌আতের স্বরূপ কি। এতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আলেমদের সেই প্রকরণ কোন শূন্যতা থেকে আসে নি বা তারা এটাকে কোন খেয়ালের বশে বা স্বার্থপরতার জন্য দু ভাগ করেন নি- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে নাফরমানী করার তো প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম হাসান আল্ বান্না (রাঃ) তার অনুসারীদের সতর্ক করতেন যেন আপেক্ষিক বিদ্‌আতের বিরুদ্ধে নিজেদের ব্যস্ত না রাখে। কারণ প্রকৃত বিদ্‌আতের মূলোৎপাটনই একটি বড় কাজ। তিনি প্রকৃত বিদআত বলতে ধর্ম বিরোধী খারাপ কাজগুলোকে বুঝাতেন–যেগুলো সম্পর্কে আলেমদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই। সে গুলোর সংজ্ঞা এবং অপকারিতা সম্পর্কেও কারো দ্বিমত নেই, অথচ মুসলমানদের মধ্যে কত বেশী ও মারাত্মক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আপেক্ষিক বিদ্‌আত (البدع الإضافيه) বলতে বুঝতেন-যা কোন সাধারণ বৈধ ভিত্তির অধীনে প্রবেশ করেছে, তবে তার রূপটি হুবহু নবীজী থেকে প্রমাণিত নয়। যেমন অন্যান্য এজতেহাদী ও বিতর্কিত ফেক্‌হী মাসায়েলের অবস্থা। এটা ছিল তার এই উপলব্ধি থেকে যে, প্রকৃত বিদ্‌আত কতই না মারাত্মক এবং এগুলোর ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করে অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকা মোটেই সমীচীন নয়।

এ ছাড়া মাযহাবগত বিতর্ক, এটা তো অবশ্যম্ভাবী একটি বিষয়। কারণ, শাখা–প্রশাখা বিষয়ে এজমা' বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুবই কঠিন। (কাজেই আমাদের কর্তব্য) আমাদের কাছে যতদূর পৌঁছেছে সে অনুযায়ী সত্যকে বিশ্বাস করা আর শাখা বিষয়ে কেউ আমাদের বিরোধিতা করলে আমরা তার ওজর অন্বেষণ করা যাতে এটা আমাদের আন্তরিক সুসম্পর্ক, পারস্পরিক ভালবাসা ও ভাল কাজে সহযোগিতার মনোভাবে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

তাঁর ঐ অভিমত হচ্ছে দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রকার বিন্যাসের একটি দিক। সূধী পাঠক অচিরেই তা প্রত্যক্ষ করবেন।

যেহেতু আমার উল্লেখ করা গ্রন্থটিতে কোন জটিলতা নেই। তাই আমি ভুলগুলোকে নির্দেশ করে প্রতিবাদের অবতারণা করার আগে সুন্নাত ও বিদআত সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করেছি। কারণ, যখন আপনি 'সুন্নাত' বুঝবেন তখন তার বিপরীত বিষয়– 'বিদআত'ও বুঝবেন।

প্রথম প্রকারের প্রসঙ্গে যদি আমি দলীল প্রমাণাদি পেশ করি এবং প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর সুন্নাত অর্থ তাঁর তরীকা বা পদ্ধতি– তাঁর আদর্শ। আর অজস্র সুস্পষ্ট দলীলাদির মাধ্যমে প্রমাণিত যে, তাঁর তরিকা হচ্ছে তাঁর আনিত সকল ভাল বিষয়কে গ্রহণ করা যা কোন সুস্পষ্ট দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং তাঁর আদর্শের বিরোধী নয়– সেটাই তাঁর সুন্নাত, যদিও ঠিক হুবহু সে কাজটি নবীজী স্বয়ং করেন নি বা করতে নির্দেশ দেন নি। আর বেদআত হচ্ছে যা কোন সুস্পষ্ট দলীল (نص) এর সাথে সাংঘর্ষিক অথবা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর আদর্শের পরিপন্থী, বা এ কাজের পরিণতিতে কোন অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। এটাই হচ্ছে আমাদের আলেমদের এ অভিমতের অর্থ যে, হাদীস শরীফে বর্ণিত 'গোমরাহ বিদ্‌আত' বস্তুতঃ শরীয়তের নির্দেশের বিপরীত– যা শরীয়ত কোন খাস বা 'আম দলীল দিয়ে কামনা করে নি। যে কাজের আবেদন শরীয়তের কোন খাস বা আম দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তা কখনোই হাদীসে প্রমাণিত সেই বিদ্‌আত নয়। যদিও তাকে আভিধানিক অর্থে "বিদ্‌আত' (নতুন কাজ) বলে আখ্যায়িত করা হোক । এ ক্ষেত্রে তা ভাল অথবা খারাপ উভয়েরই অবকাশ রাখে। আমি বিদ্‌আত সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীদের লেখাগুলো পড়ে দেখলাম যে, তাদের সব জ্ঞান-বুদ্ধি একটি মাত্র হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ (দ:)-এর বাণী– كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

–'সব নতুন কাজই বিদ্‌আত আর সব বিদ্‌আতই গোমরাহী।" আর দেখলাম তারা সকল কল্যাণকর হাদীসগুলোকে দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে। অথচ ঐ সব হাদীস দ্বারা যে কোন নতুন বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। তাদের কথা হলো– যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর যুগের পরে হয়েছে সবই বিদ্‌আত – চাই তা ভাল কিছুই হোক বা আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন ধর্মীয় বিষয়ই হোক, যদিও তা আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীরই

অন্তর্ভূক্ত হোক। বস্তুত: ভাল কিছু বেশী চাওয়াও ভাল (الإستكثار من الخير خير)।

কিন্তু তাদের কাছে সেটাও গোমরাহী–বেদ্আত। এটা তো এমন একটি জ্ঞান যার জন্য বিরাট কোন পরিশ্রমের দরকার হয় না। কিন্তু তা এদের মনে বিরাট আকার ধারণ করে আছে। প্রকৃত পক্ষে, এ হাদীসটি অন্যান্য দলীল প্রমাণাদির (Text) সাথে অবশ্যই Review করে দেখতে হবে। কারণ, এটি আম বা সাধারণভাবে বলা। অপরাপর খাস দলীলাদির দ্বারা এর উমূম বা ব্যাপকতা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য হলো :

প্রথমত : এ হাদীসটি এমন ব্যাপক [১] যা দ্বারা আসলে কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়কেই নির্দেশ করা হয়েছে। কারণ, এ হাদীসটি এমন বহু দলীলের খেলাফ যেগুলো কোন নতুন সংঘটিত বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে কিতাব-সুন্নাহ্র আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের তাগিদ জানায়। আর এই কুরআন ও সুন্নাহ্– উভয় সূত্র প্রতিটি নতুন বিষয়কেও তার হুকুমের মধ্যে শামিল করে। কারণ ঐ নতুন বিষয়টি হয় বিষয় হিসেবে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনার আওতায় পড়বে, না হয় মর্মের আলোকে বুঝে নিতে হবে। অথবা কোন দলীলের ব্যাপকতা অথবা সুনির্দিষ্টির অন্তর্ভূক্ত হবে– স্পষ্ট ভাষ্য অথবা বাহ্যিক অর্থ অথবা অন্য কিছুর অধীনে ব্যাখ্যা হবে।

দ্বিতীয়ত: পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্তে এ ধরনের নির্দিষ্ট কিছুর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ব্যাপক দলীলের (العام أريد به الخاص)নযীর পাওয়া যায়। দেখুন, আল্লাহ্ তায়ালা বলছেন– فتحنا عليهم أبواب كل شئى

–'তাদের জন্য সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম।' অথচ তাদের জন্য রহমতের দরজা খোলা হয় নি। এ ছাড়া আল্লাহ্ তায়ালার অপর এক আয়াত– (تدمّر كل شئ) –'সব কিছুকে মিসমার করবে।' অথচ পাহাড় ও আসমান জমিনকে ধ্বংস করা হয়নি। মহান আল্লাহ্র আরেক বাণী: وأوتيت من كل شئى –'আর আমাকে সব কিছু দেওয়া হয়েছে।' অথচ সোলাইমানের আরশ দেওয়া হয় নি।

ইমাম কুরতুবী তার তাফসীরে ফিতর প্রসঙ্গে সূরা রূমে বলেছেন: والعموم بمعنى الخصوص كثير فى لسان العرب

–'নির্দিষ্ট কিছু বুঝাতে ব্যাপক ভাষ্য ব্যবহৃত হয়েছে এমন ভুরি ভুরি প্রমাণ আরবী ভাষায় রয়েছে।' এরপর তিনি উল্লেখিত কথাগুলো বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাঁর কোন এক সাহাবীকে কোন এক যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে অন্যান্য সাহাবীদের তাঁকে পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনের হুকুম দিয়েছিলেন। (তাকে না মানলে) এক পর্যায়ে সেনাপতি রাগান্বিত হয়ে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তাদেরকে

১। এ ধরনের 'আম (ব্যাপক) প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রযোজ্য ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই 'আম রূপক অর্থে (مجازا) খাস এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে।

তারমধ্যে প্রবেশের হুকুম দিলেন। কারণ, মহানবী (দ:) তাদেরকে আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন তারা বললো– আমরা বিশ্বাস করলাম এবং জেহাদ করলাম শুধু আগুনের ভয়ে। পরে তারা ফিরে এসে মহানবী (দ:) কে এ কথা জানালো। শুনে তিনি বললেন – যদি তারা তাতে ঢুকতো তাহলে আর বের হতো না। কারণ, আনুগত্য তো ভাল কাজে। এই ঘটনাটি ইমাম মুসলিম তার 'সহীহ' তে সংকলন করেন। দেখুন না তার ভাষা। এ থেকে বুঝা যায়, কিছু 'আম (ব্যাপক) নির্দেশ থাকে যার দ্বারা কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। এটা বুদ্ধি অথবা শরীয়তের আলোকে লব্ধ জ্ঞানের আলোকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ হাদীসে মহানবী (দ:) সতর্ক করে দিলেন যে তিনি আনুগত্যের কথা সাধারণভাবে ব্যাপক ভাষ্যে বল্লেও উল্লেখিত আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার বিষয়টি কিন্তু এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

বুখারী ও মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে : كل بنى آدم يأكله التراب الاعجب الذنب

–'প্রত্যেক আদম সন্তানকেই মাটি ভক্ষণ করবে শুধু মেরুদন্ডের কড়িটি ছাড়া। ইবনে আব্দুলবার্র তার 'তামহীদ' গ্রন্থে বলেন- এ হাদীসের বাহ্যিক ব্যাপকতা অনুযায়ী বুঝা যায় যে, অবশ্যই সকল বনি আদম এ ব্যাপারে সমান। অথচ এ বর্ণনাও রয়েছে যে, নবীগণ ও শহীদগণের দেহ মাটি খেতে পারবে না। বুঝা গেল যে এই শব্দটি যদিও ব্যাপক বা 'আম তবুও আমাদের উল্লেখিত বিভিন্নভাবে এটার মধ্যে খুসূস বা সুনির্দিষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। কাজেই কথাটি যেন এ রকম ছিল যে – মাটি যা কিছু খেয়ে ফেলে তার মধ্যে عجب الذنب খেতে পারে না। যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, মাটি عجب الذنب খেতে পারে না তখন এটাও সম্ভব যে মাটি নবীগণ ও শহীদানের দেহও খেতে পারে না।

এছাড়া আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো যে, নবীজী নিজেই বলেছেন যে, কোন মুসলমান অন্যের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখা হারাম (আড়ি দেওয়া উচিত নয়)।[১] অথচ তিনিই আবার তাবূক যুদ্ধে পিছে পড়ে থাকা লোকদের সাথে তিন দিনের বেশী সময় কথা বললেন না এবং মুমিনদেরও তাদেরকে এড়িয়ে চলতে নির্দেশ দিলেন। এমনি করে কিছু সাহাবী কিছু লোকের সাথে আড়ি দিয়েছেন। যেমন আলী (রা:) ও উসামার মধ্যে এ সম্পর্ক ছিল। কাজেই এ হাদীসটি তার ব্যাপকতা হারিয়ে ফেলেছে এবং এটি এখন একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করছে। এ ধরনের সুনির্দিষ্ট ব্যাপকতা বহু আয়াতে পাওয়া যায়। এমন কি এ কথাও বলা হয়েছে যে, ما من عام الاخصص –'এমন কোন 'আম নেই যাকে খাস করা হয় নি।' একদল উলামা এ কথাও বলেছেন: لايعمل بالعام الا بعد البحث عما يخصصه

১। আনাস থেকে বর্ণিত, তিনি (দ:) বলেন: কোন মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার কোন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ রাখে। বুখারী/ মালেক/তিরমিযী/ আবু দাউদ ও নাসায়ী।

–'কোন 'আম হুকুমের উপর আমল করার আগে অন্বেষণ করতে হবে, এটিকে কোন দলীল কিভাবে খাস করেছে।

তৃতীয়ত: নবীজীর নিয়ম ছিল নতুন কিছু ঘটলে তিনি যদি দেখতেন এটা শরীয়ত সম্মত তাহলে তাকে সমর্থন করতেন অন্যথায় তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন। এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, উমর (রা:) একবার প্রস্তাব দিলেন যে, ইব্রাহীম (আ:) এর পদচিহ্ন অঙ্কিত পাথর– মাকামে ইব্রাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে এবং উম্মাহাতুল মু'মেনীন (নবীজীর স্ত্রীগণ) যেন পর্দা করেন। তিনি বলেছিলেন– ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার কাছে ভাল–খারাপ উভয় ধরনের লোকই এসে থাকে। তখন তার প্রস্তাবের সমর্থনে আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন– কারণ, তিনি তো দ্বীনের ভাল চেয়ে প্রস্তাব করেছিলেন। দেখুন না , ভাল বলেই তা অনুমোদন করলেন।

পক্ষান্তরে দেখুন, মুআয (রা:) যখন সিরিয়া থেকে ফিরে নবীজীকে সিজদাহ্ করলেন, মনে করেছিলেন বুঝি কাজটা ভাল– যেমনটি তিনি সিরিয়ার লোকদের তাদের পাদ্রীদের করতে দেখেছিলেন– মনে করলেন, নবীজী তো তাদের চেয়েও উত্তম, অথচ তখন রাসূলুল্লাহ্ (দ:) আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে সেজদা করতে নিষেধ করলেন। কারণ, সেজদাহ্ এই পবিত্র ও নির্ভেজাল শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং বিপরীত। কারণ, আহলে কিতাবগণ তাদের পাদ্রী ও সন্যাসীদেরকে পবিত্রতা ও ভক্তি জানাতে গিয়ে সিজদাহ করে বাড়াবাড়ি করেছে এবং তাদের কবরগুলোকে সিজদাহ্র স্থান বানিয়ে নিয়েছে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাদের নিয়ম নীতি অনুসরণকে আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। অথচ উমর (রা:) এর প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন।। কারণ, তাতে দ্বীনের মঙ্গল রয়েছে অথচ কোন ফেতনা ফাসাদের আশঙ্কা নেই।

দেখুন না, আযান মুষ্ঠিমেয় কয়েকটি শব্দের সমাহার ছাড়া কিছুই নয়। বাড়ানো যাবে না। কমানোও যাবে না। অথচ যখন বৃষ্টির কারণে প্রয়োজন দেখা দিল তখন নবীজী বললেন, ডেকে পাঠাও। বলো الا صلوا فى رحالكم –'শুনে রাখ, তোমরা তোমাদের বাহনেই সালাত আদায় কর।' এতে বুঝা যায় যে, বেশ কিছু বিষয়ে পরিণতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ বিবেচনা করে তার রায় ঘোষণা করা হয়।

শরীয়তের হুকুম কখনো কারণ দর্শিয়ে জারি হয় আবার কখনো তার কোন উল্লেখ না করেও হয়। কখনো সাহাবী নবীজীর সাথে কথা বলে কারণটা বুঝে নিতেন। এজন্যই তারা বলেছেন হাদীসের বর্ণনাকারীর সমঝ বা বুঝাটাকে অন্যদের বুঝের উপর প্রাধান্য দিতে হবে। যেমনি সাহাবীর তাফসীরকে অন্যদের তাফসীরের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

চতুর্থত: নবীজী (দ:) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি বহু এমন বিষয় রবকতময় বলে মন্তব্য করেন যা কল্যাণকর এবং এতে কোন ক্ষতির দিক নেই অথচ এটা শরীয়তের

বিধানে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর তরীকা বা আদর্শের কোনরূপ বরখেলাফও নয়। এরপর সাহাবা (রা:) থেকেও নবীযুগের পর এত অধিক সংখ্যক উত্তম কাজের প্রমাণ রয়েছে যা অর্থের দিক থেকে 'মোতাওয়াতর' বা সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত।[১]

এগুলো রাসূলুল্লাহ্ (দ:) নিজে করেন নি অথবা তার যমনাতেও হয় নি তবে তা তাঁর নির্দেশনা ও আদর্শের অন্তর্ভূক্ত।

এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিদআত বলতে ঐ সব জিনিষকে বুঝতেন যা আকীদা বা আমলের দিক থেকে শরীয়তের বিরোধী। কাজেই তারা ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে শরীয়তের ব্যাপকতাকে গ্রহণ করেছেন– যদিও ঠিক সে কাজটিই করছেন বলে নযীর নেই। যেমন আল্লাহ্র বাণী: وافعلو الخير 'তোমরা উত্তম কাজ কর।' এখানে নেক আমল করার জন্য সাধারণভাবে (অনির্দিষ্টভাবেই) অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। এবং রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর বাণী الصلاة خير موضوع 'সালাত একটি উত্তম বিষয়।' এরপর এই ভাল কাজ আদায় করার ব্যাপারে যদি শরীয়তের বিধানকে লংঘন না করে থাকেন তাহলে তো তিনি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের একটা বিরাট কাজ করেছেন।

কিছু উন্নাসিক লোক রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর নাতি হুসাইনের পুত্র ইমাম যয়নাল আবেদীনকে নিন্দে করে বড় ভুল করেছেন। কারণ, এই ইমামের বেশ কিছু নিজস্ব দোয়া দরূদ ছিল যাকে তারা এজন্য খারাপ বলেছে যে, ঐ কাজ স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দ:) করেন নি। অথচ প্রকৃতপক্ষে ঐ আমলগুলো আমাদের পূণ্যবান পূর্বসূরীদের তরীকা অনুসারেই ছিল। এর মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল মহান সাহাবা কেরামের –যারা নেক কাজ বেশী বেশী করার আকুল প্রয়াসী ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বুখারীতে আবু হুরায়রা বর্ণিত একটি হাদীস আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) বলেছেন–

من عادى لى وليًا فقد أذنته بالحرب. وما تقرب إلى عبدى بشئى احب مما افترضت عليه ومايزال عبدى يتقرب إلىّ بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وان سألنى أعطيته ولئن استعاذنى لأعيذه –

–'যে আমার কোন প্রিয়ভাজন ব্যক্তির সাথে দুষমণি করবে আমি তার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করলাম। কারণ, আমার বান্দাহ আমার প্রিয় ফরজ কাজগুলো আদায় করে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে, এরপর আমার ভালবাসা পাবার আশায় বান্দাহ

(১) অর্থগত তাওয়াতুর বা তাওয়াতুর মা'নাবী হলো এমন অধিক সংখ্যক লোক এক বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা যারা মিথ্যা বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তারা ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করলেও তা একটি সাধারণ (Common) বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। এই সাধারণ বিষয়টির উপরই তাওয়াতুর সংঘটিত হবে। হতেম তাঈর দানশীলতা, উমরের ন্যায় বিচার, আলীর ন্যায় বিচার, প্রজ্ঞা ও সাহসিকতা সকলের কাছে সুপরিচিত। এটাই হচ্ছে তাওয়াতুর মা'নাবী।

নফল ইবাদত ও ভাল কাজ করতে করতে আমার আরো নিকটতর হতে থাকে, এক সময় আমিও তাকে ভালবেসে ফেলি, তখন আমিই তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে গ্রহণ করে, তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে, যদি সে কিছু চায় , আমি দিয়ে দেই, যদি সে আমার আশ্রয় চায় আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দেই।"

অপর এক হাদীসে রয়েছে

عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطئية

–'তুমি বেশী বেশী সেজদাহ করবে, কারণ তুমি যখনই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে একটা সেজদাহ করবে তখনই আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তোমার মর্যাদা এক ধাপ বৃদ্ধি করবেন এবং এর দ্বারা একটা পাপ মুছে দিবেন।

(রিয়াদুস সালেহীন সঙ্কলিত)

তাহলে কিভাবে নফল কাজ বেশী করাকে কটাক্ষ করা যেতে পারে।

মুআয বিন জাবালের ঘটনাটি দেখুন: হেলাল ইব্‌নুল আসওয়াদ বলেন– আমি একবার মুআযের সাথে চলছিলাম তখন তিনি বললেন– বস, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান নিয়ে নেই।' ইবনে আবি শাইবাহ্,১ জামে বিন শাদ্দাদ সূত্রে দুটি ভিন্ন সনদে আসওয়াদ বিন হেলাল থেকে বর্ণনা করেন। রাবীগণ নির্ভরযোগ্য (সেকা) ও নেতৃত্বস্থানীয়। এটি আমর, তাবেঈ আলকামা সূত্রেও সঙ্কলিত।

এই তো সেই মুআয যিনি রাসূলুল্লাহ (দ:) এর সাক্ষ্য অনুযায়ী হালাল ও হারাম সম্পর্কে বেশী জান্‌তা সাহাবী। আর এই তো খলীফা রাশেদ উমর (রা:), তারা উভয়ই এই উত্তম কাজ করছেন। অথচ এটা তো রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকে প্রমাণিত নয়। কেবল ইমাম আহমাদ একটি 'হাসান' পর্যায়ের সনদে বর্ণনা করেছেন– ইবনে রাওয়াহা যখনই কোন সাহাবীর সাক্ষাত পেতেন, তাকে বলতেন আসুন, কিছুক্ষণ ঈমানের কথা বলি। এভাবে একদিন একজনকে বলতেই সে রেগে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দেখুন, ইবনে রাওয়াহা আপনার ঈমান ছেড়ে কিছুক্ষণের ঈমানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। উত্তরে রাসূলুলাহ্ (দ:) বললেন: আল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহাকে দয়া করুন। সে এমন মজলিশ পছন্দ করে যার জন্য ফেরেশ্‌তারা বাহবা দিয়ে থাকে। এ হাদীসটি বুখারীও সনদ ছাড়া উল্লেখ করেন।

১। ইবনে আবি শাইবা 'কিতাবুল ঈমান' গ্রন্থে বলেন ঃ অকী', আ'মাশ, জামে' বিন শাদ্দাদ, আসওয়াদ বিন হেলাল– এরা ক্রমান্বয়ে মুআয (রা:) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবার আবু উবাইদ 'আল ঈমান' গ্রন্থে সঙ্কলন করেন– ইবনে মাহদী, সুফিয়ান, জামে' আসওয়াদ ও মুআয সূত্রে বর্ণিত। ইবনে আবী শাইবাহ্, আমর–আলকামা সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইবনে উবাইদের সনদ ইতোপূর্বেকার সনদটির মত সেকাহ্ -নির্ভরযোগ্য।

এই তো উমর (রা:), যিনি ইরাকের ভূমি (سواد العراق) সম্পর্কে রায় দিয়েছিলেন যে, তা ভাগ– বিতরণ করা হবে না। তিনি তা আগেপরের সকল মুসলমানের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে, এটা তো ইবাদত সম্পর্কিত বিষয় ছিল না। তার জবাবে আমরা বলব, তাহলে তো আপনারাই ঐ হাদীসের ব্যাপকতাকে এবার সীমিত করে ফেললেন। অর্থাৎ 'কুল্ল' বেদ্‌আত দ্বলালাহ্– হাদিসটি।

আবার দেখুন, মদীনার আনসারগণ– যারা ঘরবাড়ী ও ঈমানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন– তারা পবিত্র কুরআন পড়ার জন্য একত্রিত হতো, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (দ:) লোকদের কুরআন পড়তে জড়ো করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু তারা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর বাণীর ব্যাপকতার অবকাশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন– ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حضرتهم الملائكة

–'যখনি কিছু লোক আল্লাহ্‌র স্মরণে একত্রিত হয় তখনি তাদেরকে ফেরেশ্‌তারা ঘিরে নেয়।' এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে সঙ্কলিত।১

পঞ্চমতঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর ও তাঁর সাহাবীদের অনুসৃত আদর্শকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা তাদের আদর্শ অনুসরণ করেন তাদেরকেও এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে। হাদীসে এসেছে– তারা যেন রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর সুন্নাত তথা আদর্শকে অনুসরণ করে আর অনুসরণ করে তার পরবর্তী সত্যপন্থী খলীফাদের (খোলাফা রাশেদীন)।২

এখানে খোলাফা রাশেদীনের 'সুন্নাত' অর্থ তাদের তরীকা– আদর্শ বা নিয়ম পদ্ধতি। তাঁরা হচ্ছেন আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, হাসান ও উমর বিন আব্দুল আযীয। তাঁরা সবাই খলীফা রাশেদ ছিলেন এবং সর্বশেষ খলীফা রাশেদ হবেন ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। এ হাদীসের আওতায় তারাও শামিল হতে পারেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তার খলীফা বা প্রতিনিধি। যেমন সাহাবা, তাবেঈন এবং তৎপরবর্তী ঐসব আলেম যারা তাঁর (দঃ) তরীকা ও নিয়ম মত চলেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসেও আছে العلماء ورثة الانبياء

–'আলেমগন নবীদের উত্তরাধিকারী।' এছাড়া আয়াতে أولى الأمر এর ব্যাপারে সে সব আলেমকেই বুঝানো হয় যারা কুরআন-হাদীস গবেষণা করে শরীয়তের হুকুম বা বিধি-বিধান নির্দেশ করতে পারেন।৩

ইবনে মাসউদ বলেন– ان الله اختار محمدا و اختار له أصحابه مما رآه المسلمون حسنا

১। কাশফুল খফাতেও উল্লেখ আছে।

১। এটা এরবাদ সূত্রে বর্ণিত আবু দাউদ ও তিরমিযী সঙ্কলিত হাদীস–فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى 'আমার আদর্শ ও আমার পরে আগত খোলফা রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করবে।'

৩। এ প্রসঙ্গে সূরা নিসার আয়াত নং ৮৩ রয়েছে : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم –'তারা যদি বিষয়টি মহান রাসূল ও তাদের বিশিষ্ট আলেমদের উপর ন্যস্ত করতো তাহলে তাদের গবেষকগণ তা জানতে পারত।'

فهو عند الله حسن-'আল্লাহ্ তায়ালা মুহাম্মদ (দঃ) কে মনোনীত করেছেন আর তাঁর জন্য বাছাই করেছেন তাঁর সঙ্গীদের। কাজেই মুসলমানরা যা ভাল বলে সাব্যস্ত করবে তা আল্লাহর কাছেও ভাল।' এ হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আহ্মাদ তার মুসনাদে। যে এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে আসলে ভুলই করেছে। এটা হাসান হাদীস(যা গ্রহণীয়)।।

এজন্যই তো তাঁদের বাণী ও মতামতের এত তাৎপর্য ও সম্মান। আর এজন্যই তারা যখন কোন সাধারণ ব্যাপক দলীলের (اصل عام) অধীন কোন ভাল কাজ সংযোজন করেন তাকে বেদআত বা গোমরাহী বলা হয় না। তবে হ্যাঁ, যা কিছু রাসূলুল্লাহ্ (দ:) নিজে করেছেন তাকে 'সুন্নাত' বলে অভিহিত করা হয়।

ষষ্টত: উল্লেখিত আলোচনার মাধ্যমে কেউ হয়তো বুঝতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (দ:) থেকে প্রমাণিত আছে এমন কোন ইবাদতের স্থলে যদি কেউ কিছু নতুন ইবাদতের উদ্ভাবন করে তা জায়েয। তার এ ধারণা ভুল। কারণ তা হচ্ছে খারাপ বিদ্আত।

এ ধরনের একটি নযীর হচ্ছে বনু উমাইয়াগণের স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ঈদের নামাযের আগে তার খুৎবাহ্ পড়া। এতে তারা নবীজীকৃত বিন্যাসের খেলাফ করেন। কাজেই এটা ও অনুরূপ কর্মকান্ড কখনোই কল্যাণ ও উত্তম কাজের শামিল নয়। তবে ঈদের সালাতের আগে ও পরে অন্য সালাত আদায় করার ব্যাপারটি এ থেকে ভিন্ন। কারণ এটি যদিও নবীজী থেকে সরাসরি প্রমাণিত নয় তবে এটা একটা সাধারণ নীতি বা (Common) দলীলের আওতাধীন। সেটা হচ্ছে তার হাদীস- والصلاة خير موضوع (নফল) সালাত একটি উত্তম বিন্যাসযোগ্য বিষয়- যে কোন সময়ে পড়া যায়, এতে মাকরূহ হয় না। তবে সুন্নাত হলো- ওয়াক্তের আগে বা পরে পড়া উচিত নয়। তাই সুন্নাত অনুযায়ী আমল করাই উত্তম।

(সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ্ আল্ - হাদ্দাদের পান্ডুলিপি থেকে)

رأى وجيه فى شذوذ الشاطبى عن الجمهور فى تقسيم البدعة : বিদ্আতের প্রকরণে অধিকাংশ আলেমের মত থেকে শাতবী যে ব্যতিক্রমী অভিমত দেন সে সম্পর্কে স্পষ্ট রায় ঃ

(আমি বলব) : যেহেতু বিরুদ্ধবাদীরা সব সময় বিদ্আতের প্রকার বিন্যাসে 'এ'তেসাম' গ্রন্থকার শাতবীর মতামতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্ব সাধারণের বিপরীতে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে থাকেন এবং এ বিষয়ে জমহুরের মতামতকে তা দ্বারা প্রতিহত করতে প্রয়াস পেয়ে থাকেন। সেহেতু আমি এ মতের অপনদনে 'আল-কাওলুল মুবীন' গ্রন্থে মুহাদ্দেস শেখ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ সিদ্দিক এর বক্তব্যটি এখানে উপস্থাপন করা সমীচীন মনে করছি।

ইজ্জদ্দীন বিন আব্দুস সালাম তার 'আল কাওয়ায়েদুল কুব্রা 'গ্রন্থে বিদ্আতকে বিভক্ত করেছেন তার কল্যাণকারিতা ও অকল্যাণকারিতা বা এতদুভয় থেকে তা মুক্ত থাকার ভিত্তিতে। তিনি শরীয়তের হুকুম (Order) এর পাঁচটি প্রকারের অনুরূপ বিদ্আতকেও পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন- ফরজ-ওয়াজেব, নফল, হারাম, মাকরূহ ও জায়েয এবং প্রতিটির উদাহরণও তিনি দিয়েছেন এবং শরীয়তের বিধি-বিধান থেকে তার নযীরও পেশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, একজন বিজ্ঞ সমালোচকের যিনি ফেক্হা শাস্ত্রীয় নিয়ম-পদ্ধতি ও সূত্র সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং শরীয়তদাতা বিভিন্ন হুকুম বা বিধি-বিধানের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ-অকল্যাণকে বিবেচনা করেন তা সম্পর্কে সম্যকজ্ঞাত। এ বিষয়টি বোঝার ব্যাপারে আলেম সম্রাটের মত আর কে আছে? কাজেই তিনি ফেক্হা শাস্ত্রের মূলনীতির ভিত্তিতে বেদ্আতের প্রকার বিন্যাস করেছেন। আর ফেকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি ও সূত্র খুবই মজবুত। এ জন্যই ইমাম নববী, হাফেয ইবনে হাজার ও উলামা সাধারণ তাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং তার বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন। তারা মত প্রকাশ করেন যে, এভাবে আমল করা কেবল মাত্র আকস্মিক বিপদ-বিপর্যয় এবং যুগ বিবর্তনের ধারায় উদ্ভব বিষয়াদির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে এ'তেসাম গ্রন্থকার আলেমদের এ ঐকমত্যের বাইরে অবস্থান নিলেন এবং উপরোক্ত প্রকার বিন্যাসকে প্রত্যাখান করে ব্যতিক্রমী মত প্রকাশ করলেন। তার স্বপক্ষে তিনি প্রমাণ স্বরূপ বললেন- এ ধরনের প্রকার বিন্যাস ফেকাহ্ শাস্ত্রে সম্মত নয় এবং কল্যাণ অকল্যাণের উপর ভিত্তিশীল নিয়ম-সূত্র থেকেই বহুদূরে। এখানে এর ভাল দিকটা বোঝা যায় না, যাতে কাজটি করে তার ভাল দিকটা অর্জন করা যেতো, এখানে এর খারাপ দিকটাও উপলব্ধি করা যায় না যে তা বর্জনের মাধ্যমে তা থেকে বেঁচে থাকা যেতো। এমনও নয় যে, এ দুটো অবকাশ থেকে এটা মুক্ত যাতে তাকে গ্রহণ ও বর্জন সমানভাবে জায়েয হতো।

পরিশেষে তিনি প্রমাণ দেন যে, তিনি উসূলে ফেকাহ্ শাস্ত্রের এতটুকু স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন নি যা দ্বারা কোন কিছুর হুকুম বা বিধি-বিধান নির্দেশের পদ্ধতিগুলো জানতে সক্ষম হতেন। জানতে পারতেন বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে কিভাবে এসব সূত্র ব্যবহার করে সঙ্গতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যদিও উসূলে ফিকাহ্ বিষয়ে الموافقات নামে তার একটি পুস্তক রয়েছে বটে কিন্তু সেটা খুবই সাদামাটা ও গুরুত্বহীন। হ্যাঁ, তিনি আরবী ব্যাকরণে পারদর্শী ব্যক্তি। এ বিষয় তিনি আল্ফিয়া ইবনে মালেক গ্রন্থটির ব্যাখ্যামূলক একটি চার ভলিয়মের পুস্তক রচনা করেন। এতে আরবী ব্যাকরণে তার শক্তিমত্তার পরিচয় মেলে।

আমরা জানি যে, যদিও সাধারণভাবে উসূলে ফেকাহ্ সম্পর্কে শাতবীর জ্ঞান রয়েছে তবু সন্দেহ নাই যে, সুলতানুল উলামা এ বিষয়ে অধিকতর পারঙ্গম। উসূলে ফেকাহ্

এর নিয়ম-নীতি ও সূত্র সম্পর্কে তার জ্ঞান বেশী সমৃদ্ধ। তার 'আল- কাওয়ায়েদুল কোবরা' এর উত্তম প্রমাণ। আমি বিস্মিত, কিভাবে শাতবী, সুলতানুল উলামার ঐ প্রকার বিন্যাসকে প্রত্যাখান করতে পারলে। অথচ তিনি শরীয়তদাতা কর্তৃক গৃহীত নিয়ম কল্যাণ-অকল্যাণ বিচারে আহকামের বিন্যাস-এর উপর ভিত্তি করেই ঐ প্রকার বিন্যাসটি করেছিলেন।

অথচ এই শাতবী মালেকী মাযহাবে استصلاح নিয়মটি প্রত্যাখান করলেন, যে নিয়মটি শরীয়তদাতাও গণ্য করেন নি, উলামা সাধারণও গ্রহণ করেন নি বরং তারা তা প্রত্যাখান করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে কোন হুকুম -আহকাম নির্দেশ করতে অস্বীকার করেছেন। মালেকীরা এ রকম করলেও অন্যরা তা প্রত্যাখান করেছেন। কারণ, শারে' তা কখনোই অনুমোদন করেন নি। এ বিষয়টি সমর্থন করে ঐ বিষয়টি অস্বীকার করা একটা সুস্পষ্ট মাযহাবী পক্ষপাতিত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ঐ প্রত্যাখানের জন্যই তিনি كل بدعة ضلالة এ হাদীসটি গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ কোন বাছ-বিচার ছাড়াই যে বিদ্আত গোমরাহী (ضلالة) তা হচ্ছে আকীদাগত বিদ্আত। যে ধরনের আকীদাগুলো মু'তাযেলা, কাদরিয়া, মরজিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় সালফে সালেহীনের আকিদার বরখেলাফ উদ্ভব করেছিল; এই বিদ্আতগুলোই হচ্ছে গোমরাহী। কারণ সেগুলো সবই অকল্যাণকর, এতে কল্যাণকারিতা নেই। আর আমলী বিদ্আত হচ্ছে- এমন কিছু কাজের উদ্ভব করা যার সাথে ইবাদত ইত্যাদির একটা সম্পর্ক রয়েছে- অথচ কাজটি প্রথম যুগে প্রচলিত ছিল না। এ ধরনের বিদ্আতে অবশ্যই প্রকার বিন্যাস করতে হবে, যার উল্লেখ ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম করেছেন। এখানে এ কথা খাটে না যে ঢালাওভাবে এর সবগুলোই গোমরাহী। কারণ, যুগ ও জেনারেশনের প্রবাহে এ ধরনের ঘটনা দেখা দেয়। আর প্রতিটি ঘটনা সম্পর্কেই এই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য যে, বিষয়টিতে আল্লাহ্র নির্দেশনা রয়েছে- হয় সুস্পষ্ট দলীল হিসেবে নয়তো এজতেহাদের কোন এক পদ্ধতিতে। আর এই বিধান সকল স্থান ও কালের জন্য উপযোগী। আর এ শরীয়ত হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ শরীয়ত। এ জন্যই এতে রয়েছে ব্যাপক সূত্র ও মৌলিক নিয়ম পদ্ধতি। এর সাথে আল্লাহ্তায়ালা প্রদান করেছেন এ শরীয়তের আলেমদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ বোঝার শক্তি, কেয়াস ও এস্তেসহাব ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। এ সবই হচ্ছে আমাদের এ মহান শরীয়তের বৈশিষ্ট্য।

যদি আমরা শাতবীর তরীকা অনুসরণ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, প্রথম যুগে ছিল না এমন সব কাজই গোমরাহী বেদ্আত এবং এর অন্তর্নিহিত ভাল ও খারাপের দিকগুলোকে হিসেবে না আনি তাহলে শরীয়তের বিধি-বিধান ও নিয়ম-সূত্রের এক বিরাট অংশকে বাদ দিতে হবে। বাদ দিতে হবে এর বিভিন্ন কেয়াসকে এবং শরীয়তের সুবিস্তৃত বৃত্তকে গুটিয়ে নিয়ে আসতে হবে অনেক। এতে যে কী ক্ষতি ও সমস্যার সৃষ্টি

হবে তা বলাই বাহুল্য। কাজেই এই নাতিদীর্ঘ বর্ণনার আলোকে শাতবী (রা:) এর উক্ত প্রত্যাখানের অসারতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো যে, ইজ্জুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালামের মতটিই সঠিক এবং উলামা সাধারণ এ মতকে সমর্থন করেছেন।

المولد النبوى الشريف

এই গ্রন্থে 'বিদ্আত ও সুন্নাহ' প্রবন্ধে যা আলোচিত হয়েছে এটাই মীলাদ শরীফ জায়েয প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু যেহেতু শেখ ইবনে মানী' তার حوار পুস্তিকায় এবং শেখ তুওয়াইজেরী তার الرد القوى পুস্তিকায় আলাদাভাবে অনেকগুলো পৃষ্ঠা বরাদ্দ করে মীলাদুন্নবী শরীফ এর উপর আক্রমণ শানিয়ে তা বিদ্আত প্রমাণিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, কাজেই আমি এ বিষয়ে অচিরেই একটি আলাদা পুস্তক প্রকাশ করব, ইন্শা-আল্লাহ। তবে কথায় বলে- ما لايدرك كله لايترك جله -'বাদ দেওয়ার চেয়ে একটু নেওয়াও ভাল।' তাই এ বিষয়ে তাদের প্রতিবাদে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদের ডীন ও শামের বিশিষ্ট আলেম মোহতারম ডঃ মোহাম্মদ সাঈদ মোল্লা রমাদান আল- বূতী এর একটি লেখা এখানে পেশ করব যাতে সংক্ষেপে হলেও প্রয়োজনীয় প্রতিবাদ ও উত্তর রয়েছে যাতে প্রমাণিত হয় যে, নবীজীর মীলাদ শরীফ উদযাপন কোন বিদ্আত নয় বরং সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত।

الفصل العاشر

দশম অধ্যায়

ردا على الذين ينكرون الاحتفال بالمولد النبوى :

ليس كل جديد بدعة

بقلم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى

মীলাদুন্নবী (দ:) উদ্‌যাপনকে অস্বীকারকারীদের জবাবে

সব নতুনই বিদ্‌আত নয়

–ড: মুহাম্মদ সাঈদ রমাদান আল্–বূতী

বিদ্‌আত, শরীয়তের পরিভাষায় এমনই এক পথভ্রষ্টতা যা থেকে দূরে থাকা অবশ্যকরণীয় এবং এমন কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য সতর্ক করা উচিত। যে কাজ গোমরাহী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ ও মতানৈক্যের অবকাশ নেই।

এ ব্যাপারে মূল দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর এই বাণী : من أحدث فى امرنا هذا مالیس منه فهو رد

–'যে আমাদের এই বিষয়ে নতুন কিছুর অবতারণা করবে যা তা থেকে উদ্‌গত নয় তা প্রত্যাখাত।' (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর আরেক বাণী :

إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

–'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহ্‌র কিতাব, সর্বোত্তম আদর্শ– মুহাম্মদের আদর্শ, আর নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে নতুন বিষয়াদি, আর সব বেদআতই গোমরাহী। (মুসলিম বর্ণিত)

কিন্তু এই 'বিদ্‌আত' শব্দটির অর্থ কি?

এর অর্থ কি এই আভিধানিকভাবে মানুষেরা যা বুঝে থাকে, তা? এতে বিদ্‌আত বলতে কি এমন সমূদয় বিষয়কে বুঝাবে যা মুসলিম নরনারীর জীবনে দেখা দিবে –যা রাসূলুল্লাহ্ (দ:) নিজে অথবা তার কোন সাহাবী কখনো করেন নি বা তাদের কাছে সুপরিচিত নয়?

জীবন এখনও তার বাহকদের সাথে বিভিন্ন অবস্থা ও প্রেক্ষিতে মোড়–পরিবর্তন করে চলেছে। এবং নিয়ে যাচ্ছে এক আঙ্গিক থেকে আরেক আঙ্গিকে। আর এই অমোঘ অনিরুদ্ধ ধারাকে বদলে দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এও সম্ভব নয় যে, যুগের ক্রমবিবর্তন সত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট অবস্থায় জীবনকে স্থির ও স্থবির রাখার জন্য পেরেক মেরে দেওয়া যায়। এমনকি, যে সুনির্দিষ্ট সময় খন্ডটিতে রাসূলুল্লাহ্ (দ:) তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন সে সময়কালেও জীবন একটি নির্দিষ্ট ছকে বাধা পড়ে জমে যায় নি। বরং নবীজী একেকটি পর্যায়ের পর আরেকটিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু (সে প্রথম যুগের লোকদের সৌভাগ্য বশত:) মোস্তফা (দ:) তাদেরই মাঝে বিদ্যমান ছিলেন। এবং তিনি জীবনের এই অমোঘ বিধানকে স্বাগত জানাচ্ছিলেন– এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিপ্লব বা বিদ্রোহ ছাড়াই। তিনি কত যে নতুন মূল্যবোধকে সমর্থন যুগিয়েছেন। আর সাহাবী ও আরব জীবনে কতনা নতুন নতুন অনুষঙ্গ সংযোজিত হয়েছিল যা তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন– সে সবের আহবান জানিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি সেগুলোকে পর্যবেক্ষকের গভীর দৃষ্টি দিয়ে চিন্তা করে যখন দেখলেন– সে সব দ্বীনের মৌলনীতি ও বিধি–বিধানের আদৌ বিরোধী নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা সে সব গোত্র ও মহল্লাবাসীর জীবন–যাপন প্রণালীকে করে দিয়েছিল সহজতর। আর তাই তা গ্রহণ করেছিলেন উত্তমভাবে। আর এ থেকেই ইসলামী শরীয়তের পন্ডিতগণ এই সূত্র গ্রহণ করেছিলেন যে:الأصل فى الاشياء لاباحة 'বস্তুনিচয়ের মূল বিধান হচ্ছে তা বৈধ।" অর্থাৎ কোন বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান না থাকলে সেটাকে মৌলিকভাবে বৈধ বস্তু বা বিষয় হিসেবে ধরে নিতে হবে। আর এই সূত্র থেকে হানাফী আলেম ও অন্যান্যরা এই সূত্র উদ্ভাবন করেছেন যে, সামাজিক প্রথা –নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে–একটি প্রামাণিক সূত্র (Reference), যাকে শরীয়তের অন্যান্য সূত্র ও বিধি–বিধান থেকে খাটো করে দেখা যাবে না। কাজেই এটা আদৌ যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে না যে ঐ 'বিদআত' দ্বারা এ ধরনের আভিধানিক ও ব্যাপক অর্থ বুঝাবে।

বরং আমি তো একজন মুসলিম আলেম বা ফকীহকেও দেখিনি যে বিদ্‌আতের এমন উদ্ভট ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা দিয়েছেন। বরং শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থকেই নির্দেশ করছে। আসুন, দেখা যাক্, সেটা কি?

الدين والبدعة

দ্বীন ও বিদ্‌আত

আমার সামনে বিদ্‌আতের অনেকগুলো সংজ্ঞা রয়েছে। সবগুলোই একটি অভিন্ন পারিভাষিক অর্থের পরিমন্ডলে ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও বর্ণনাভঙ্গি ও শব্দ বিন্যাসের দিক থেকে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। আমি এগুলোর মধ্যে দুটি সংজ্ঞাকেই চয়ন করছি– যা ইমাম শাতবী তার আল্– এ'তেসাম (الإعتصام) কিতাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আর আমি ও দুটোকে গ্রহণ করেছি দুটি কারণে–

এক : ইমাম শাতবীকে ঐ সকল আলেমদের পুরোধা গণ্য করা হয় যারা এ বিষয়টিকে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখা ও পর্যালোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত : তাকে অগ্রবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বেদ্আত বিরোধী লড়াকু ও কড়া আলেম গণ্য করা হয়ে থাকে।

প্রথম সংজ্ঞা : «هى طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله عز وجل»

–'ধর্মে এক নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি যা শরীয়তের সমতূল্য বিবেচনা করে আল্লাহ্র ইবাদত আরো বেশী ভালভাবে করার উদ্দেশ্যে পালিত হয়ে থাকে।'

দ্বিতীয় সংজ্ঞা : طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

–'দ্বীনে এমন নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি যা শরীয়তের বিকল্প হিসেবে একই উদ্দেশ্যে পালন করা হয়ে থাকে।'

শাতবী (রা:) এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যেই দ্বিধাগ্রস্ত বিচরণ করেছেন। কারণ, কেউ কেউ যে বিদ্আতকে শুধু ইবাদতে সীমাবদ্ধ করেছেন, এর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং যারা সকল আচার- আচরণের শামিল করেছেন তাদের মতের প্রতিও লক্ষ্য রেখেছেন। তবে পরবর্তীতে তিনি এদিকে ঝুঁকেছেন যে, বিদ্আত শুধু ইবাদতেই সীমাবদ্ধ। চাই এর হৃদয়গত দিকে হোক অর্থাৎ আকিদা বিশ্বাস অথবা আচার আচরণগত দিকে হোক– আর তা হচ্ছে অন্যান্য সকল ইবাদত।

এখন এই দ্বিধাগ্রস্ততার দিকে চিন্তা–গবেষণা করা আমাদের কাজ নয় বরং আমাদের যা কাজ তা হচ্ছে তার সংজ্ঞায় এ কথাটির দিকে লক্ষ্য করা–' طريقة فى الدين مخترعة (ধর্মে নব উদ্ভাবিত পন্থা)।

কাজেই সুলূক বা আচার–আচরণও যাতে বিদ্আতের অর্থ ও বিধি–বিধানের আওতায় পড়ে সেজন্য সে কাজটি ঐ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমন বিশ্বাসে করতে হবে যে সেটা ধর্মের কাঠামোর অন্তর্গত– এবং এটা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ– অথচ বাস্তবে বিষয়টি তার সম্পূর্ণ উল্টো। এটাই হচ্ছে বিদ্আতের প্রাণ আর এ কারেণই শরীয়ত প্রবর্তক এ কাজ থেকে সতর্ক করেছেন। এটাই হচ্ছে ঐ কাজকে 'বিদ্আত' বলে আখ্যায়িত করার ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আর অকাট্য দলীল হিসেবে এখানে প্রামাণ্য বিষয়টি হলো রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর বাণী :

من أحدث فى امرنا هذا ماليس منه ..... –যে আমাদের এ বিষয়ে (ধর্মে) নতুন কিছুর অবতারণা করবে– যা এর অন্তর্ভূক্ত নয়..' এটি । কাজেই امرنا هذا আমাদের এ বিষয়কে বলতে বুঝানো হয়েছে স্পষ্টত: দ্বীন বা ধর্মকে।

এবং নবীজীর ঐ বাণী – যা তাহাবী সঙ্কলন করেছেন :

« ستة لعنهم الله وكل نبى مجاب : الزائد فى دين الله، والمكذب بقدر الله، والمتسلط بالجبروت يذل من أعز الله ويعز به من اذل الله، والتارك لسنتى والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتى ماحرم الله »

–'ছয় ব্যক্তির উপর আল্লাহ্র অভিশম্পাত, আর প্রত্যেক নবীর দোআই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয়, (১) যে আল্লাহ্র দ্বীনে কিছু বাড়িয়ে দেয় (২) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে অস্বীকারকারী, (৩) পরাক্রমশালী লোক যদি এমন কাউকে অসম্মান করে যাকে আল্লাহ্ ইজ্জত দিয়েছেন এবং এমন লোককে ইজ্জত করে যাকে আল্লাহ অপমানিত করেছেন (৪) আমার আদর্শকে ত্যাগকারী (৫) আল্লাহ্র হারাম শরীফকে যে অপমান–অপবিত্র করে (৬) আমার পরিবার পরিজনকে যে অপমানিত করে – যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন।'

এ হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, বিদ্আতকে খারাপ বলা বা এ কাজকারীকে প্রত্যাখান করার মূল কারণ হচ্ছে– বিদ্আতকারী দ্বীনের কাঠামো ও মূল বিষয়ে এমন কিছু জোর করে ঢুকিয়ে দিতে চায় যা আদৌ দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত নয়। আর শরীয়ত তো দিয়েছেন খোদ আল্লাহ্ তায়ালা– কাজেই এর মধ্যে কিছু বাড়ানো –কমানো বা কোন রকম পরিবর্তন সাধন করার কোন অবকাশই নেই।

তবে অন্যান্য কার্যাদি ও ক্রিয়াকলাপ–যা কখনো কখনো মানুষের দ্বারা হয়ে থাকে– যাকে ধর্মের মৌলিক বিষয়ের কোন অংশ বা এর কোন হুকুম মনে করা হয় না। বরং এ রকম করার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন বা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব স্বার্থে কাজ করা। এটাকে তো কক্ষণই বেদ্আত বলা যেতে পারে না। যদিও বিষয়টি মুসলমানদের জীবনে একটি অভূতপূর্ব ও নব–উদ্ভাবিত। বরং এ ক্ষেত্রে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, এটা কি ঐ শ্রেণীভূক্ত যাকে 'সুন্নাতে হাসানাহ্' বলে অভিহিত করেছেন– নাকি ঐ শ্রেণীভূক্ত যাকে 'সুন্নাতে সাইয়্যেয়াহ' বলেছেন। আর আপনি আশা করি জানেন যে, মুসলিমের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর একটি বাণী আছে–

« من سنّ فى الاسلام سنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئى ومن سن فى الاسلام سنة سئية كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من أوزارهم شئى »

–'যে ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করেন তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব এবং যারা তারপর ঐ আমল করল তাদের সওয়াব, তবে তাদের সওয়াবে কোন ঘাটতি হবে না, আর যে ইসলামে কোন খারাপ সুন্নাত (রীতি) প্রচলন করল তার জন্য রয়েছে সে কাজের পাপ এবং যারা তারপরে ঐ কাজ করবে তাদের পাপ। তবে তাদের পাপে কোন ঘাটতি হবে না।'

ما هو المعيار
মানদন্ড কি ?

এ বিষয়টি আলাচনা করতে গেলে দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন কিন্তু আমরা এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরছি :

–যদি মানুষের কাছ থেকে প্রকাশিত কার্যাদি ও ক্রিয়াকলাপ (যা বেদ্আতের অর্থে পড়ে না– যা ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে) শরীয়তে সুপ্রতিষ্ঠিত আদেশ–নিষেধ এর সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাকে বলা হয় মোখালাফাত (হারাম বা মাকরূহ)– আল্লাহ্র শরীয়তের বিরোধিতা। এই বিরোধিতা চাই নব উদ্ভাবিত হোক অথবা পুরোনো– যেমন চারিত্রিক অধ:পতন ও খারাপ কাজে ব্যবহৃত ক্লাব ইত্যাদির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে এটার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আর যদি এটা নিরপেক্ষ ধরনের হয় অর্থাৎ শরীয়তের কোন বিধি–বিধান অথবা বিস্তারিত আদব–কায়দার সাথে সঙ্গতিশীল বা অসঙ্গতিশীল কিছুই নয় এমন হয় –তাকে তার হুকুম (Order) অনুযায়ী রঙ লাগানো হবে। অর্থাৎ এর প্রভাব ও ফল ইত্যাদি অনুযায়ী এর বিধান নির্দেশ করা হবে। এর মধ্যে যেটি ঐ পাঁচটি প্রয়োজনীয় বস্তুর কোন একটি বাস্তবায়নে সহায়ক হবে– যা লালন করার জন্যই ধর্ম এসেছে, সেটা হবে সুন্নাতে হাসানাহ্ বা উত্তম রীতির অন্তর্ভূক্ত। আর ঐ পাঁচটি জিনিষ হচ্ছে– (ধর্ম, জীবন, জ্ঞান, বংশধারা ও সম্পদ)। এরপর এগুলো সাধারণ বৈধতা থেকে অবশ্যকরণীয়-এর মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে। আর তা হয়ে থাকে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এর প্রয়োজনীয়তার তারতম্য অনুযায়ী। কারণ, ঐসব উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন (مصلحة) কখনো ঐ পাঁচটি বস্তুর সত্তাগত অনিবার্য প্রয়োজনে হয়ে থাকে। আবার কখনো তা হয়ে থাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে। আবার কখনো এগুলো হয়ে থাকে উপকারী সৌন্দর্যকরণ পর্যায়ের। আর যে কাজ ঐ পাঁচটির কোন একটি প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে ধ্বংসের কারণ হয় অথবা তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটা হবে সুন্নাতে সাইয়্যেয়াহ– খারাপ রীতি। এক্ষত্রেও ঐ উদ্দেশ্য হাসিলে বাধা হয় বা উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী এর খারাপ হওয়ার পরিমাণের তারতম্য হবে। কাজেই এটি কখনো হতে পারে মাকরূহ, আবার কখনো হারাম।

আর যে কাজ এ ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব অথবা উদ্দেশ্য সাধনে উপাকারী হওয়া থেকে দূরে থাকবে সেটি হবে 'মুবাহ' বা 'করলে দোষ নেই' এ পর্যায়ের।

আমরা যখন এই সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো তখন বুঝতে পারব যে– এমন কোন দিক নেই যাকেন বিদআতে হাসনাহ বলে অভিহিত করা যায়, যেমনটি কিছু গবেষক ধারণা করে থাকে। কারণ, সেটা তো নিকৃষ্ট গোমরাহীই হয়ে থাকে।

কারণ সেটা অনিবার্যভাবে ধর্মের উপর কিছু বাড়তি জিনিষ আরোপ করারই নামান্তর। এটা কোন অবস্থাতেই ভাল বা 'হাসানাহ্' হতে পারে না।

কাজেই 'বিদআতে হাসানাহ্' বলে যাকে তারা ধারণা করে আসলে সেটা নবীজীর দেওয়া নাম 'সুন্নাতে হাসানাহ্' এর অন্তর্ভূক্ত। যাকে পরবর্তীতে 'উসূলীগণ'(ইসলামী আইন শাস্ত্রের বৈয়াকরণ) مصالح مرسله 'মাসালেহে মুরসালাহ' বা বহুল চর্চিত কৌশল বলে পরিভাষাগত নাম রেখেছেন।

এ ধরনের সুন্নাতে হাসানাহ্র কিছু উদাহরণ হচ্ছে ঐ সব অনুষ্ঠান ও মাহ্ফিল যা মুসলমানরা বিভিন্ন উপলক্ষ্যে আয়োজন করে থাকেন। যেমন নতুন হিজরী নববর্ষ, সাইয়্যেদুনা মুস্তাফা (দ:) এর জন্ম দিবস, ইস্রা ও মে'রাজ এর স্মরণে আলোচনা, মক্কা বিজয়, বদর যুদ্ধ ইত্যাদির আলোচনা। সে সব অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ধর্মের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয়– চাই তা আবশ্যকীয় বা প্রয়োজনীয় অথবা সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ পর্যায়ের হোক।

এসব কিছুর মূলে কথা একটাই যে, যেন এসব কাজের দ্বারা কোন ভাল উদ্দেশ্য ও স্বার্থের ক্ষতি না হয় বা ক্ষতি হওয়ার মত পটভূমি সৃষ্টি না করে।

মীলাদ শরীফ বিদ্আত নয়

এটাই আমাদের বিশ্বাস যে, বিদ্আতের আলোচনা, এর বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং এ থেকে মানুষকে দূরে রাখা এ সব বিষয়ে আমাদেরকে জ্ঞানের পথ ধরে এগুতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করতে হবে– যার কোন বিকল্প নেই। আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা মানহাযে এল্মী আমাদেরকে নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় :

রাসূলুল্লাহ্ (দ:) এর মীলাদ স্মরণে বা এ ধরনের অন্যান্য উপলক্ষ্যে মুসলমানগণ যে সব অনুষ্ঠানাদি করে থাকে এটাকে সর্বাগ্রে অন্তত: 'বিদ্আত' বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ, এটা যারা করে তাদের কেউ আদৌ এই বিশ্বাস করে না যে, এটা দ্বীনের মৌলিক কোন অংশ অথবা এটা ধর্মের অন্যতম খুঁটি বা সারবত্তা যে, যারা তা পালন করবে না তারা গুনাহ্গার হবে। বরং এটি একটি সামাজিক কর্মকান্ড যার উদ্দেশ্য ধর্মীয় কোন কল্যাণ অর্জন।

তাছাড়া এটা সুন্নাতে সাইয়্যেয়াহ-এর অন্তর্ভূক্ত নয়। আমার মূল সতর্কতা হবে যাতে এটা সংঘটন বা প্রতিষ্ঠার সময় কোন গোনাহের কাজ না হয় এবং প্রত্যাশিত শুভ কাজে কোন ক্ষতি বা বিপর্যয় আসতে পারে এমন যে কোন কাজ থেকে পরিমার্জিত থাকা।

আর যখন আমরা দেখতে পাই যে, এটাতে এমন কিছু কাজ মিশ্রিত হয়ে যায় যা অনেক কুফল বয়ে নিয়ে আসে, তখনই এই দূষণীয় মিশ্রণের প্রতি সতর্ক হতে হয়,

তবে মূল কাজটির প্রতি নয়। না হয় এমন তো অনেক ইবাদত আছে যা বৈধ ও শরীয়ত নির্দেশিত অথচ অনেক লোক তা বেঠিকভাবে পালন করে থাকে। এতে উল্টো ফল লাভ হয়। এ জন্য কি ঐ কাজ বা খোদ ইবাদতটা পালন করাই বাদ দিতে হবে?

হ্যাঁ, মীলাদ শরীফের ঘটনা শোনার জন্য লোকদের সমাবেশ, এটি নবুওয়্যত যুগের পরে প্রচলিত একটি বিষয়। বরং এটি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর প্রথম দিকেই কেবল প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু শুধু কি এটাই এ কাজকে বিদআত বলার জন্য যথেষ্ট? এ করণেই কি এটিকে রাসূল্লাহর বাণী –'যে আমাদের ধর্মে এমন নতুন কিছু করবে যা ধর্মের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত " এ হাদীসের আওতাধীন করা ঠিক হবে? তাহলে তারা তাদের জীবন থেকে ঐ সব কিছুই বাদ দিক যা নবীজীর যুগের পর নতুনভাবে সৃষ্টি হয়েছে– যদি তারা তা আদৌ পারে----। কারণ, সেগুলো সবই বিদ্আত।

এত সবের পরেও বলব: ধরে নিন, আমরা বিদআতকে এভাবে বুঝার বেলায় ভুলই করেছি, আর শুদ্ধ হচ্ছে যা অন্যরা বলেন--- যে, যা কিছু মানুষ নতুনভাবে অবতারণা করবে তা-ই বিদ্আত। চাই তা দ্বীনের মূল বিষয় বা এর বিধি বিধানের অন্তর্ভূক্ত না হলেও। সেটাই হারাম বিদআত। সে ক্ষেত্রেও মাসআলাটি তো একটি মতভেদমূলক বিষয় যা গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

আর আল্লাহর পথে দাওয়াত ও আমর বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার-এর আহবানের আদব হিসেবে এটা সবারই জানা যে, এ ক্ষেত্রে দাওয়াতদাতা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত বিষয়াদির গন্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকবেন। তিনি এখতেলাফী মাসআলাতে নিষেধ করতে যাবেন না। তাতো গবেষক মুজতাহেদদের কাজ। আর তাও যার গবেষণা যতদূর পৌঁছেছে সে পর্যন্তই তাঁর অভিমত সীমিত থাকবে। কারণ, এই সকল এজতেহাদী মাসআলায় নিষেধ করতে গিয়ে যতই গভীরে যাওয়া হোক তা শেষ হবে না। শুধু বিভেদ আর মুসলিম ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করবে যা পারস্পরিক হিংসা হানাহানিকে উস্কে দিবে।

অথচ আমাদের জীবনে ও আমাদের চারপাশে এমন সব প্রকাশ্য ও মারাত্মক পাপাচার চলছে যার সুদূর প্রসারী কুফল সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। সেগুলো কি যথেষ্ট নয় যে, এই সব জঞ্জাল ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে আমরা আমাদের জীবন কাটিয়ে দেই। সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে আমরা এ সবের মূলোৎপাটন করি। যে বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ্ একমত, যে খারাপ কাজ দূর করার ক্ষেত্রে চুপ থাকার কোন ওজর নাই, সে ব্যাপারে কেন আমরা নিচেষ্ট বসে থাকি? অথচ আমরা ব্যক্তিগত কিছু গবেষণায় বিজয়ের জন্য উন্মুখ থাকি যা অন্যদের গবেষণার সাথে সংঘাতময়.....।

ডঃ আল্–বূতীর প্রবন্ধ

خاتمة
উপসংহার ঃ

মহান আল্লাহ্রই সকল প্রশংসা ও দয়া। তাঁরই সাহায্য ও তৌফিকে এ গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শেষ হলো। আল্লাহ্র কাছে এ দোয়াই করি, তিনি যেন এ কাজটিকে গ্রহণ করেন এবং সকলের উপকারে আসে। বিশেষ করে তাঁর হাবীব ও মোস্তফা – সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (দ:) এর উম্মতের হৃদয়গুলোকে আরো কাছাকাছি করে দিন। তারা যেন তাঁর আনিত হকের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। কারণ, আমি এ গ্রন্থে কিতাব ও সুন্নাহ্ থেকে শরীয়তের দলীলাদি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। আমাদের মহান পূর্বসূরী আলেমগণের অভিমত ও কর্মকে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছি। তা ছাড়া বিপক্ষের জবাব প্রদানের সময় ইসলামী আদব রক্ষা করতে চেষ্টা করেছি। কারণ, হেকমত মুমিনের হারানো ণিধি"। আশা করি, তারা সত্যের দিকে অগ্রসর হবেন এবং যখন বুঝতে পারবেন তখন তারা তা গ্রহণ করবেন। কারণ, এর দলীল–প্রমাণাদি সুস্পষ্ট। সে সব ভাইদের মানসিক বাঁধামুক্ত হওয়ার সময় সমাগত। তাদের এবং ইসলামী দুনিয়ার আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতে তথা অধিকাংশ মুসলমানদের মাঝে যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়ে আছে, তা দূর হতেই হবে। সময় এসেছে, একজন মুসলিম হজ্জ করবে এবং তার নবীর (দ:) কবর শরীফ ও মসজিদ নববী শরীফ যেয়ারত করবে প্রীতি ও ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের সহজ-সুন্দর পরিবেশে। কিভাবে আমরা আমাদের শত্রু– ইহুদী, নাসারা, অগ্নিপূজক ও তাদের দোসরদের উপর বিজয় লাভ করব, যখন আমরা নিজেরাই নিজেদের ঐক্যবদ্ধ মনে করি অথচ আমাদের হৃদয়গুলো নানাদিকে বিক্ষিপ্ত। পরস্পরকে কাফের, মুশরেক, বেদ্আতি বলে বেড়াচ্ছি। আল্লাহ্ তায়ালা তো বলেছেন– ان اللهَ لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

–'যে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয় না আল্লাহ্ তাদের মধ্যে পরিবর্তন আনেন না।

যাক, উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া। তিনিই তৌফিকের মালিক। তিনি ভিন্ন কোন আশ্রয় বা শক্তি নেই। তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং ভরসা করি। তারই জন্য প্রথম ও শেষ প্রশংসা।

ওয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলা সাইয়্যেদেনা মুহাম্মদ, ওয়া আলেহী ওয়া সাহ্বিহী ওয়া সাল্লাম।

প্রণয়ন করেছি :
(আল্লাহ্র ফকীর)
সাইয়্যেদ ইউসুফ সাইয়্যেদ হাশেম রেফাঈ
আল্-মানসূরিয়া - কুয়েত।